আজকের বিশ্ববাস্তবতা

সভ্যতার বিলয় ও নতুন সভ্যতার উন্মেষ

আবুল কাসেম ফজলুল হক*

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি ও জীবপ্রযুক্তির বিপ্লব এবং সাধারণভাবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ ও বিস্তার পৃথিবী সকল রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। সর্বত্র এর ফলে, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও সভ্যতা বিপর্যস্ত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দরকার ছিল বিশ্বব্যাপী সকল ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, পর্যায়ক্রমে অন্যায় হ্রাস ও ন্যায় বৃদ্ধি এবং উন্নততর সভ্যতা সৃষ্টি। দরকার ছিল প্রগতিশীল নতুন নেতৃত্ব। কিন্তু তা দেখা দেয়নি। বাস্তবে সকল রাষ্ট্রে ও গোটা বিশ্বব্যবস্থায় কায়েম হয়েছে কায়েমি-স্বার্থবাদীদের মালিকানা ও কর্তৃত্ব। চলছে যুদ্ধের পর যুদ্ধ। ফলে সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছে, এবং মানুষ অমানবিকীকৃত হয়ে চলছে। পরিত্যক্ত পুরাতন সংস্কার-বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এর মধ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কল্যাণে উৎপাদন বাড়ছে, বৈষয়িক সম্পদ বাড়ছে, আর নতুন সভ্যতা সৃষ্টির তাগিদও দেখা দিচ্ছে।

সমাধান হতে পারে সকল রাষ্ট্র নিয়ে ফেডারেল বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠা দ্বারা। জাতিরাষ্ট্র সমূহের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয় দ্বারা, গণতন্ত্রকে পুনর্গঠিত করে, গড়ে তুলতে হবে শতভাগ মানুষের গণতন্ত্র, বা সর্বজনীন গণতন্ত্র, বা নয়াগণতন্ত্র। বিশ্বসরকার গঠন করতে হবে জাতিরাষ্ট্রসমূহ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে। জাতীয় সরকার সমূহের ক্ষমতার ক্ষুদ্র অংশ চলে যাবে বিশ্বসরকারের কাছে। জাতিরাষ্ট্র, জাতীয় সংস্কৃতিও জাতীয় ভাষা বিকাশমান থাকবে। বিশ্বসরকারের কাছে একটি সেনাবাহিনী রেখে সকল রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করা যাবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের, কিংবা বহুত্বমূলক সমন্বয়ের নীতি অবলম্বন করে সৃষ্টি করবে হবে আন্তরাষ্ট্রিক বা আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি ও বিশ্বমানবতা। এমনি করে সৃষ্টি করতে হবে নতুন উন্নত সভ্যতা। এই বক্তব্যটি প্রকাশ করা হয়েছে : ১.পরিবর্তনের ধারায় আজকের বিশ্ববাস্তবতা, ২. সভ্যতার স্বরূপ, ৩. আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিলয় ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস, ৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ও বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠনের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা, ৫. নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র – এই কটি উপশিরোনামের আওতায়। নতুন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য প্রথম পর্যায়ে দরকার আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক আন্দোলন – দরকার সকল জাতির মধ্যে *নতুন* রেনেসাঁস।

---

* সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. পরিবর্তনের ধারায় আজকের বিশ্ববাস্তবতা

গত তিন দশকের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির অভিঘাতে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র মানুষের পরিবেশ ও মানুষ বদলে গেছে, এবং পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত আছে।

মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যার সমাধান অনেকখানি হয়েছে, এবং বৈষয়িক সম্পদ অনেক বেড়েছে। কিন্তু ন্যায় ও অন্যায়ের বেলায় যা ঘটা উচিত ছিল, ঘটেছে ঠিক তার উল্টোটা : অন্যায় বেড়েছে, ন্যায় কমেছে। মানুষের নৈতিক চেতনা নিম্নগামী। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন, শেষ পর্যন্ত মানুষের চেতনা থেকে ন্যায়-অন্যায়ের বোধ কি উবে যাবে?

রেনেসাস, শিল্পবিপ্লব, ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার, ফরাসি বিপ্লব, জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, প্যারি কমিউন, রুশ বিল্পব, চিনবিল্পব, উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং শিল্প সাহিত্য ইতিহাস দর্শন জীবনাদর্শ রাষ্ট্রাদর্শ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছশো বছর ধরে মানবজাতির যে বিকাশ, সাধারণভাবে তা ছিল প্রগতির ধারায়। ওই সময়টাই আধুনিক সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশের কাল। এর মর্মে ছিল রেনেসাঁসের স্পিরিট যা এখন প্রায় নেই। তবে আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে শিল্পবিপ্লবের ধারা নানা পর্যায় অতিক্রম করে বহমান আছে। ক্রমে পশ্চিম ইউরোপের প্রগতিশীল ভাবধারা ও ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পূর্বইউরোপের এবং এশিয়া আফ্রিকা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার জাতি সমূহের মধ্যে, এবং এসব জাতিও সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে প্রগতির ধারায় চলতে থাকে। তবে এটাও অবশ্য উল্লেখ্য যে, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এবং বিভিন্ন ভূভাগের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহ নতুন সভ্যতা নিয়ে মানবজাতির মূল ধারায় শামিল হতে পারেনি। তাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে আদিবাসী করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো হয়ে উঠেছে উপনিবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী।

ইতিহাসের সে পর্বে মানুষের উপলব্ধিতে বর্তমান যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হোক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ছিল। এর মধ্যে প্রগতির পরিপন্থী ও হীন-স্বার্থান্বেষী কার্যক্রমও ছিল। তবে সেগুলো দ্বারা প্রগতির ধারা বাধাগ্রস্থ হলেও থেমে যায়নি– সাময়িক ক্ষয়-ক্ষতির পর বেগবান হয়েছে।

মানবজাতির এই প্রগতির ধারায় মৌলিক সঙ্কট দেখা দেয় দুই বিশ্বযুদ্ধের কালপর্বে। বিশ্বযুদ্ধ আসলে সভ্যতার সঙ্কটেরই অভিব্যক্তি। দুই বিশ্বযুদ্ধকে পটভূমিতে রেখে সঙ্কট আজো বিকাশমান। সঙ্কটের প্রবাহের মধ্যে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার আয়োজন দেখা দেয় মার্কসবাদ অবলম্বন করে। মার্কসবাদের পটভূমিতে আছে রেনেসাঁস, এনলাইটেনমেন্ট ও রিফর্মেশন, এবং সিন্ডিকালিজম, ফেবিয়ানিজম, সোস্যাললিজম, এনার্কিজম ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ। মার্কসবাদের প্রাধান্য লাভের ফলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ বিকশিত হতে পারেনি। মার্কসবাদীরা মানবজাতির আলোকদীপ্ত প্রগতিশীল নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় যেভাবে চলেছিলেন, তা অতুলনীয়। ইউরোপে গণতন্ত্রীরাও তখন কল্যাণরাষ্ট্রের আদর্শ উদ্ভাবন করে আশাবাদী হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ শতকের অন্তিম পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্বইউরোপের এগারোটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মার্কসবাদ ত্যাগ করে পুঁজিবাদ অবলম্বন করার পর সাধারণভাবে মানবজাতিই আর প্রগতির ধারায় নেই। মনে হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের সঙ্গে সভ্যতার ধারারই বিলয় ঘটেছে।

ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও জাতি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। মানুষ অপরিসীম শক্তি ও অন্তহীন সম্ভাবনার অধিকারী – এই বোধ ছশো বছর ধরে মানবজাতির মধ্য থেকে যেভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, বিশ্বযুদ্ধ-পর্বে এসে তা আর বজায় থাকেনি। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে তখন দেখা দেয় চরম নৈরাশ্যবাদ। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তির বলে ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত সাধনা ও সংগ্রাম দ্বারা সব কিছুকে মনের মতো করে পুনর্গঠিত করে নিতে পারবে, পৃথিবীকে ঋদ্ধিমান ও সম্প্রীতিময় করে তুলবে – এ বিশ্বাস মানুষের মনে দৃঢ়মূল ছিল। শ্রমজীবী সাধারণ

মানুষেরা তখন জাগ্রত ছিল, এবং তাদেরকেও দেখা হত অতন্ত সম্ভাবনাময় সত্তা রূপে। ভবিষ্যত নিয়ে মানুষের মধ্যে ছিল বাস্তবভিত্তিক, বাস্তবায়নসম্ভব, অন্তহীন কল্পনা। মানুষের সামনে বাস্তব জীবন, বাস্তব সমাজ, বাস্তব রাষ্ট্র ও বাস্তব পৃথিবীর উর্ধ্বে ছিল অভিপ্রেত আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ, আদর্শ রাষ্ট্র ও আদর্শ পৃথিবী। আদশর্কে বাস্তবায়িত করার জন্য সাধনা ও সংগ্রাম ছিল।

অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির বিস্তার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের (১৯৯১) পর সেসব আর নেই। কল্যাণরাষ্ট্রের ধারণাকে বিকশিত না করে সিভিল সোসাইটি ও এনজিও নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। মানুষের মধ্যকার আদর্শবোধ ও আদর্শসন্ধিৎসা উবে গেছে। এখন পৃথিবীব্যাপী মানুষ ভুগছে অদ্ভুত এক হীনতাবোধে (inferiority complex)। মানুষের সমাজে নৈতিক শক্তি ক্ষীয়মাণ, সৎসাহস দুর্লভ, সৃষ্টিশীলতা দুর্গত। ব্যতিক্রম আছে। আমি ব্যতিক্রমের কথা বলছি না, সাধারণ অবস্থাটার কথা বলছি। পৃথিবীব্যাপী বিপুল অধিকাংশ মানুষ এখন কেবল বর্তমান নিয়ে স্বপ্নহীন, কল্পনাহীন, ভোগলিপ্সু জীবন যাপন করছে। আর যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে এবং অত্যুন্নত প্রযুক্তির সুবিধা নিতে পারছে, তারা নিরঙ্কুশ ভোগবাদী জীবনে মেতে আছে। পৃথিবীর কোথাও জনগণ আর ঐক্যবদ্ধ নেই। *উন্নততর নতুন পৃথিবী সৃষ্টির প্রশ্নে – 'মানুষে পারবে'র জায়গায় 'মানুষে পারবে না'– এই হল মানুষ সম্পর্কে এখনকার মানুষের ধারণা।* এখন সমাজের অন্তর্গত পশুশক্তি মানুষীশক্তির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর বিশ্বব্যবস্থা বদলে গেছে, পৃথিবী হয়ে পড়েছে এককেন্দ্রিক, সর্বত্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন উদ্যমে পুঁজিবাদী রূপ দেওয়া হচ্ছে – পুঁজিবাদের অন্যায় সমূহ অবাধে বেড়ে চলছে, আর মানুষ সামাজিক গুণাবলি হারিয়ে চলছে (dehumanization of man in society)। সকল রাষ্ট্রেই জুলুম-জবরদস্তি, শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা ও সহিংসতা দ্রুত বাড়ছে। মানবীয় সব কিছুরই সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়ে চলছে। বসনিয়া হারজেগোবিনা থেকে আফগানিস্তান ইরাক হয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালানো হচ্ছে।

নতুন প্রযুক্তির মালিকানা ও ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা সর্বজনীন কল্যাণে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলার জায়গায় উন্নততর নতুন আইন-শৃঙ্খলা গড়ে তুলছে না। সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার নামে তারা কঠোর থেকে কঠোরতর আইন-কানুন ও বলপ্রয়োগমূলক বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও কার্যকর করে চলছে– সামাজিক ন্যায় বাড়ানোর কথা ও অন্যায় কমানোর কথা একটুও ভাবছে না।

বাংলাদেশে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে র‍্যাব (Rapid Action Battalion) ও তার শাখা-প্রশাখা চিতা, কোবরা ইত্যাদি। তারপর এদের নিয়ে চালানো হচ্ছে ক্লিন হার্ট অপারেশন, এনকাউন্টার, ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের নামে বিনাবিচারে কথিত সন্ত্রাসী হত্যা। নতুন করে কার স্বার্থে কেন এ ব্যবস্থা চালু করতে হল, এর গতি কোন দিকে – প্রগতিকামী সকলেরই তা তলিয়ে দেখা কর্তব্য।

মধ্যপ্রাচ্যে তেলসমৃদ্ধ রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্রের নামে যুদ্ধ ও গণহত্যা চালিয়ে পুতুল-সরকার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সাহযোগী বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ লুটে নিচ্ছে। সামাজিক অবিচার বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট সহিংসতার নাম দেওয়া হয়েছে 'সন্ত্রাস'। কথিত 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধে'র আর কথিত 'গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে'র সম্ভাবনা ক্রমেই বাড়ছে। মানবজাতি আজ এমন এক অবস্থায় পড়েছে যে, শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মানুষ শতকরা পাঁচভাগ মানুষের হীন উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট (২০১১-১২) থেকে বলা হচ্ছে, বর্তমান ব্যবস্থায় শতকরা একভাগ লোক বাকি শতকরা নিরানব্বইভাগ লোককে বঞ্চিত করে নিজেদের জন্য সম্পত্তির ক্রমবর্ধমান পাহাড় গড়ে চলছে। তাঁদের মতে, শোষণ-পীড়ন-প্রতারণা ও বঞ্চনাই বর্তমান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বায়নের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য। বিশ্বায়নবিরোধী প্রায় সকলেই এই ধারায় চিন্তা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নে তাঁরা কল্যাণকর কিছুই দেখতে পান না।

অত্যুন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এই কালে উন্নত জীবনের বিরাট-বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা, বিশ্বব্যবস্থা ও মন-মানসিকতার কারণে মানবজাতি নিপতিত হয়েছে এক দারুণ সঙ্কটে। সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়ার

জন্য এবং উন্নততর নতুন বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আজ দরকার ভবিষ্যতমুখী দৃষ্টি নিয়ে রেনেসাঁস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ন্যায়, প্রগতি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি ধারণার আমূল পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন ও নবায়ন। অতীতের উপলব্ধি ও চিন্তা নিয়ে কেবল চলমান দুর্দশার মধ্যে আবর্তিত হওয়াই সম্ভব, প্রগতি অসম্ভব। বিষয়গুলোকে দেখতে হবে ব্যক্তিপর্যায়ে যেমন, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও – সর্বসাধারণের কথা বিবেচনায় নিয়ে। উত্তরাধুনিকতাবাদ (postmodernism) এসব বিষয়কে master discourse ও grand narratives বলে বিবেচনার বাইরে রাখে, সমগ্রের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল অংশের দিকে দৃষ্টি দেয়, আর সমাধানের বিবেচনা বাদ দিয়ে কেবল সমস্যা বিশ্লেষণ করে। উত্তরাধুনিকতাবাদের মর্মে আছে শূন্যবাদ (nihilism) কিংবা নৈরাশ্যবাদ (pessimism)।

পরিবর্তিত বাস্তবতায় উন্নত জীবন ও উন্নত পরিবেশের জন্য যা কিছু করা দরকার, সবই করতে হবে। বিশেষ ও নির্বিশেষ, নির্দিষ্ট ও সাধারণ, অংশ ও সমগ্র, সমগ্রতাবোধ ও বৈচিত্র্যবোধ – সব দিকেই দৃষ্টিকে প্রসারিত রাখতে হবে। বুঝতে হবে যে, কেবল উচ্চশ্রেণির শতকরা পাঁচভাগকেই নয়, মধ্য ও নিম্নশ্রেণির শতকরা পঁচানব্বই ভাগকেও সব সময় যথোচিত বিবেচনায় ধরতে হবে। আর বুঝতে হবে যে, নতুন বাস্তবতায় গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক আগেকার সব ধারণাই জনগণের জন্য এখন অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কালের প্রয়োজনে এই সবকিছুকেই নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত ও বিকশিত করতে হবে। অতীত সম্পর্কে নতুন জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার শিক্ষা নিয়ে তাকাতে হবে ভবিষ্যতের দিকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর, নতুন প্রযুক্তির বাস্তবতায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা বিশ্বে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে, বিশ্বায়নের নামে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারণারাজি ও কার্যক্রমকে ক্রমাগত পুনর্গঠিত ও নবায়িত করে চলছে। মনে হয়, বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারার চিন্তা ও কাজে নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছে। প্রগতিশীল উলেখযোগ্য কোনো সংগঠিত শক্তির সন্ধান কি পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর কোথাও?

অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আমরা রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার যে পুনর্গঠন ও নবায়ন চাই, তা সর্বজনীন কল্যাণে, যারা দুর্বল শোষিত ও বঞ্চিত, অবশ্যই সেই শতকরা পঁচানব্বই ভাগেরও কল্যাণে। যারা দুর্বল তারা শক্তিশালী হতে পারে কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিজেদের নেতৃত্ব তৈরি করে। উন্নততর নতুন ভবিষ্যতের জন্য প্রচলিত কোনো চিন্তাধারা ও কর্মধারাকেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আমাদের উদ্ভাবন করে নিতে হবে আমাদের কাম্য রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি। তার জন্য দরকার নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নতুন জাগরণ।

দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হবে, পশ্চিমের দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী-সাহিত্যিকদের মহান সব ভাবধারা আত্মস্থ করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই; কিন্তু তাদের কূটনীতি, গোয়েন্দানীতি, প্রচারনীতি ও লগ্নিপুঁজির জালে আটকা পড়লে সর্বনাশ। আমাদের আজ দরকার এমন জ্ঞান যা কাজে লাগবে – কর্মের অবলম্বন হবে (at once a method of enquiry and a mode of action)। যে জ্ঞান প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে সর্বজনীন কল্যাণে কাজে লাগে না, লাগবে না, তার দরকার কী? সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়নতত্ত্বে আমাদের উন্নতির সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়, আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা-চেতনা বিকৃত হয়।

যে সভ্যতার-সঙ্কটে মানবজাতি আজ নিপতিত তার প্রকৃতি ও তা থেকে উদ্ধার লাভের উপায় সম্পর্কে বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে আমার কিছু উপলব্ধি ও ধারণা এই লেখায় আমি ব্যক্ত করছি। যারা তরুণ, সন্ধিৎসু, গ্রহিষ্ণু, ন্যায়কামী, সৃজনাকাঙ্ক্ষী, প্রগতিপ্রয়াসী তাদের মধ্যে উন্নত ভবিষ্যত সৃষ্টির তাড়না সূচিত হলে এই প্রয়াস সার্থক হবে।

ইউরোপ-আমেরিকায় চিন্তার, অনুসন্ধানের ও গবেষণার অন্ত নেই। প্রায়শ সেগুলো একপেশে – পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারায়। সেগুলো জানতে চেয়েছি, কিন্তু সেগুলো দ্বারা আমি আমার মনকে আচ্ছন্ন হতে দিতে চাইনি।

আমি স্বাধীনভাবে সর্বজনীন কল্যাণে চিন্তা ও বিচার-বিবেচনা করেছি। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদে সর্বজনীন কল্যাণের বিবেচনা নগণ্য, তাতে প্রকৃতিসৃষ্ট বৈষম্যের উপর শক্তিমানেরা ও ক্ষমতাবানেরা অতিরিক্ত বৈষম্য আরোপ করে। ইউরোপ-আমেরিকার মহান প্রগতিশীল ভাবধারার প্রতি সব সময়ই আমার গ্রহণোন্মুখতা আছে।

নতুন সভ্যতার প্রয়োজনে একে একে আমরা আলোচনা করব – সভ্যতার স্বরূপ, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিলয় ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ও বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠনে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা এবং 'নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র' বিষয়ে। আমাদের উদ্দেশ্য নতুন সভ্যতা সৃষ্টির উপায় সন্ধান।

২. সভ্যতার স্বরূপ

সভ্যতার বিলয় ও নতুন সভ্যতার সম্ভাবনা বিবেচনা করার আগে আমাদের দরকার সভ্যতার স্বরূপ সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপলব্ধি । বাংলা ও ইংরেজিতে রচিত ইতিহাসের অনেক বইতেই বিভিন্ন সভ্যতার চমৎকার বিবরণ আছে। কিন্তু সভ্যতা কী – এ-প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে গেলে সেসব বই নিয়ে নিরাশ হতে হয়। সভ্যতার স্বরূপ বিষয়ে পর্যাপ্ত চিন্তা সুলভ নয়। এ অবস্থায় সভ্যতার স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ কাজ নয়।

সভ্যতা ও civilization কথা দুটির অর্থ সুনির্দিষ্ট নয়। বাংলা ও ইংরেজিতে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় দুটি শব্দই। কোনো জাতির জীবনে কোনো ধারণাকে কার্যকর করতে হলে সেই ধারণাসম্পৃক্ত পরিভাষাকে যথাসম্ভব দ্ব্যর্থহীন ও অবিসংবাদিত করার দরকার হয়। বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনা-সমালোচনা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে তা হয়ে থাকে। অবশ্য সভ্যতা ধারণার ব্যাপার, এ বিষয়ে সকলের ধারণা-যে হুবহু এক হয়, তা নয়।

বাংলায় প্রতিদিনের কথাবার্তায় সভ্যতা বলতে বোঝায় সদাচার বা ভদ্রতা। অসভ্য মানে অভদ্র – সদাচারণ যে জানে না। এটা ব্যক্তি পর্যায়ের কথা। ভারতীয় ঐতিহ্যে দেখতে পাই, 'সভা' 'সভ্য' ও 'সভ্যতা'– এই শব্দগুলো পরস্পর সম্পর্কিত – বুৎপত্তিগত দিক দিয়ে যেমন, অর্থের দিক দিয়েও তেমনি। সভা মানে সম্মেলন, সংগঠন, সম্মিলিত জীবন, যৌথ জীবন। সভ্য মানে সংগঠিত বা সম্মিলিত বা যৌথ জীবনের অংশিদার – সংগঠনের সদস্য। আর সভ্যতা হল সভ্যের বা সদস্যের গুণাবলি – সম্মিলিত বা যৌথ জীবনে অংশিদার হওয়ার ও অংশিদার থাকার গুণাবলি। সংস্কৃতে সভ্য বলতে বোঝায় যিনি সভার উপযোগী, যেখানে বহুজন বদ্ধভাবে মিলিত হয় সেখানকার উপযোগী। এক কথায় সভ্যতাকে বলা যায় সামাজিক গুণাবলি। প্রাচীন ভারতে নগরবাসীদের সভ্য আর গ্রামবাসীদের অসভ্য বলার রীতি ছিল। আর্য ও অনার্যের (ম্লেচ্ছ = মিশ্র) মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত প্রখর ছিল। আর্যেরা অনার্যদের মনে করত অসভ্য। মধ্যযুগে সবদেশেই আভিজাত্যবাদ প্রবল ছিল। ভারতে ছিল, আজো আছে, জাতিভেদ। দেশভেদে সামাজিক গুণাবলির ধারণায় কমবেশি বিভিন্নতা দেখা যায়। প্রত্যেক দেশেও সময়ের ব্যবধানে সামাজিক গুণাবলির ধারণা বিভিন্ন রকম।

প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর যৌথ বা সম্মিলিত জীবনধারায় সভ্যতা আছে এবং সভ্যতার ধারায় যুগ-যুগান্তর আছে। আর প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক যুগের সভ্যতায় আছে চড়াই-উতড়াই। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী সভ্যতার সম্পর্ক আছে সভা, সমিতি, সঙ্ঘ, সংসদ, ঐক্য, শৃঙ্খলা, সহিষ্ণুতা, গ্রহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, সৃষ্টিশীলতা ও উন্নতিশীলতার সঙ্গে। সভ্যতার সম্পর্ক আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন – রাজনীতি-অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও প্রগতি ইত্যাদির সঙ্গে। সভ্যতার মর্মে আছে ন্যায়নিষ্ঠা, সদ্ভাব, শিষ্টাচার, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, জীবনযাপনপ্রণালির উৎকর্ষ ও সৃষ্টিশীলতা। সভ্যতা একটি নৈতিক ধারণা– বর্বরতার বিপরীত। এর মর্মে আছে ভালো থাকার এবং ভালো রাখার প্রবণতা ও প্রত্যয়। কোনো জাতির জীবনে সভ্যতার সঙ্কটের অর্থ হল জনজীবনে এসব গুণাবলি কমে যাওয়া এবং পারস্পরিক সম্পর্কে শিথিলতা (alienation/estrangement) দেখা দেওয়া।

ইতিহাসে সভ্যতাকে মনে করা হয়েছে দৈশিক বা জাতীয় ব্যাপার। বিভিন্ন জাতির সভ্যতায় প্রভাবের পারস্পারিকতা আছে। তা-সত্ত্বেও দেখা যায়, ঐতিহ্য ও সভ্যতার দিক দিয়ে প্রত্যেক দেশ বা প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র।

আর সভ্যতা গতিশীল – বিকাশশীল। পরিবার থেকে গোটা বিশ্ব পর্যন্ত ছোট-বড় প্রত্যেক জনগোষ্ঠী ও সংগঠনই হতে পারে সভ্যতার ইউনিট। সভ্যতা ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যাপার যেমন, তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারও।

প্রতিটি সভ্যতাই উদ্ভব ও বিকাশের ধারা ধরে – শৈশব কৈশোর যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের স্তর পার হয়ে – বিকশিত হয়েছে। প্রত্যেক জাতির জীবনে এক সভ্যতার বিলয়ে, কিছু সময়ের ব্যবধানে, নতুন আর এক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। দুই সভ্যতার মাঝখানের সময়টা কেটেছে উদীয়মান শক্তি ও বিলীয়মান শক্তির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। উদীয়মান ও বিলীয়মান শক্তির প্রখর দ্বন্দ্বের কালকে বলা হয় ক্রান্তিকাল বা যুগসংক্রান্তি (transition period)। প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও সংস্কৃতিক ব্যাপার – কোনো জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনধারার ব্যাপার। প্রাচীন সভ্যতা, মধ্যযুগের সভ্যতা, আধুনিক সভ্যতা, এশীয় সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, চিনা সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা, মুসলিম সভ্যতা ইত্যাদি কথা অবলম্বন করে ইতিহাসের গতিধারায় বর্বরতার বিপরীতে সভ্যতা ব্যাপারটিকে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সব দেশেই সভ্যতার বিকাশ ঘটে বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার বিরোধের মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক সমাজে এই চলমানতার মধ্যে কখনো সভ্যতার শক্তি, কখনো বর্বরতার শক্তি প্রবল হয় ও কর্তৃত্ব করে। সমাজে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতারও প্রতিযোগিতা ও বিরোধ থাকে। সমস্যা জটিল হয় এই কারণে যে, প্রতিটি সভ্যতার মর্মেই বর্বরতার শক্তিও নিহিত থাকে। কোনো কিছুই অবিমিশ্র নয়, নির্ভেজাল নয়, অন্তর্বিরোধ ও আন্তর্বিরোধ থেকে মুক্ত নয়। *আর সব কিছুর মূলে মানুষ। মানবচরিত্রের জটিলতা অন্তহীন। বর্বরতা ও সভ্যতার কারবার এই জটিল মানবচরিত্র নিয়ে। সভ্যতার বেলায় মানবচরিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে সম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা ও সংঘাত।*

ইংরেজিতে ব্যক্তিপর্যায়ে অসভ্য অর্থে uncivilizaed কথাটি চালু আছে। আর civilization কথাটির যোগ দেখা যায় civil, civic, civics ইত্যাদির সঙ্গে। পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায়, civilization-এ গুরুত্ব পায় রাষ্ট্রগঠন, সমাজগঠন, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ অর্জন, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার, সৃষ্টিশীলতা ও প্রগতিশীলতা, আর সম্মিলিত জীবনে সর্বমাত্রিক প্রস্ফুটনের প্রয়াস। সব কিছুর মূলে থাকে উৎপাদনে ও নির্মাণে এবং সৃষ্টিতে ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনে কুশলতা। civilization ব্যাপারটিকেও দেখা হয়েছে দৈশিক বা জাতীয় ব্যাপার রূপে – যদিও কখনো কখনো world civilization বা বিশ্বসভ্যতার কথাও বলা হয়েছে। কোনো জাতির সভ্যতাই সরলরৈখিক গতিতে চলে না, তাতে যুগ-যুগান্তর আছে – প্রত্যেক যুগেরই চড়াই-উতরাই আছে। প্রত্যেক civilization-এরই আছে সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি। civilizationও একটি নৈতিক ধারণা – barbarism-এর বিপরীত।

প্রাচীন ভারতের মতোই প্রাচীন গ্রিসেও ধারণা প্রচলিত ছিল যে, নাগরিকই সভ্য, গ্রাম্যই অসভ্য। প্রাচীন গ্রিকরা মনে করত পৃথিবীতে তারাই উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও সভ্য, আর বাকি সব জনগোষ্ঠী যাদের ভাষা তারা বুঝত না তারা অনুন্নত, নিকৃষ্ট ও বর্বর (barbaroi)। সমাজ বিভক্ত ছিল দাস ও প্রভুতে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর *সাংস্কৃতিকী* গ্রন্থের 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে উলেখ করেছেন, ভারতীয় ও গ্রিক ধারায় অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, 'সভ্য' শব্দ মূলত 'গোষ্ঠী-সম্পৃক্ত', তারপর 'জনসমাগম–সম্পৃক্ত', শেষে 'ভদ্র, সংযত, সংস্কারযুক্ত' – 'refined, civilized'। পরবর্তীকালে রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন, শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসনপ্রণালি, রাজনীতি-অর্থনীতি – সবই সভ্যতার আওতায় আসে।

culture-এর ধারণার সঙ্গে civilization-এর ধারণার মিল পাওয়া যায়। অনেকে civilization এবং cultare-কে এক করে দেখেন। বাংলায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণাও অনেক সময় এক হয়ে যায়। অবশ্য ইংরেজিতে, এবং ইংরেজির অনুসরণে বাংলায়ও, কেউ কেউ দুটি ধারণাকে সতর্কতার সঙ্গে আলাদা রাখতে চান। তাঁরা সভ্যতা বলতে জাতীয় জীবনে মানুষের বস্তুগত নির্মাণের উন্নতি ও উৎকর্ষকে, আর সংস্কৃতি বলতে জাতীয় জীবনে মানুষের চিন্তাগত সৃষ্টির উন্নতি ও উৎকর্ষকে বুঝিয়ে থাকেন। রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালি, বাড়িঘর, দালানকোঠা,

প্রাসাদ, সৌধ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্প-কারখানা ইত্যাদির উন্নতিকে তাঁরা ধরেন সভ্যতার কোঠায়; আর দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, ইতিহাস, সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্পকলা, ধর্ম, আদর্শ, নীতি, আচার-আচরণ, জীবনপ্রণালি ইত্যাদির উন্নতিকে ধরেন সংস্কৃতির কোঠায়। হয়তো বলা যাবে, সভ্যতা মানবীয় সৃষ্টির structure এবং সংস্কৃতি superstructure. আসলে রাস্তাঘাট, দালানকোঠা, সৌধ ইত্যাদি সভ্যতা নয়, সভ্যতার বাহন; আর দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, নাটক, শিল্পকলা ইত্যাদিও সংস্কৃতি নয়, সংস্কৃতির বাহন। এ ধারায় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্ম সন্ধান করলে শেষ পর্যন্ত দুটোকে এক ও অভিন্ন মনে হয়। কারো কারো মতে সংস্কৃতি মানুষের ব্যক্তিত্বের তুল্য, আর সভ্যতা মানুষের সম্পদের তুল্য। 'আমি আছি', আর 'আমার আছে' – এই দুটি কথা দ্বারা সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য দেখানো হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতি – দুয়ের মধ্যেই প্রগতির ধারণাও অন্তর্ভুক্ত আছে। মনে রাখতে হবে, *গতি ও প্রগতি এক নয়। গতি স্বতঃস্ফূর্ত– মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ। কিন্তু প্রগতি ইচ্ছাসাপেক্ষ, চেষ্টাসাপেক্ষ, অর্জনসাপেক্ষ – চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি, মূল্যবোধ বা নৈতিক চেতনা প্রয়োগ করে বিশেষ স্থান-কালের জন্য প্রগতি উদ্ভাবন ও অর্জন করতে হয়।* সভ্যতা ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়, জাতিতে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ও বিশ্বব্যবস্থায় বিস্তৃত ও বিকাশমান। সংস্কৃতিও তাই।

সভ্যতা বিষয়ক মনুসংহিতার ধারণার সঙ্গে ইউরোপীয় civilization-এর ধারণার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে বাংলায় সভ্যতার ধারণা কিছুটা রূপ লাভ করেছে। আজকের দিনে সভ্যতা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনুশীলনের ব্যাপার যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশি সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুশীলনের ব্যাপার। তা ছাড়া সভ্যতা একটি ঐতিহাসিক ব্যাপারও : প্রতিটি সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে কারণ-করণীয়-করণ ও ফলাফলের সূত্র ধরে। মানুষের ইতিহাস অন্য সব প্রাণীর ও জড়বস্তুর ইতিহাস থেকে ভিন্ন। ভিন্ন এই দিক দিয়ে যে, মানুষের আছে ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তি। অন্য সব কিছুর ইতিহাস যেখানে কারণ-কার্য সূত্র ধরে বিকশিত, সেখানে মানুষের ইতিহাসে করণীয় বা কর্তব্যেরও কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে। মানুষের ইতিহাসে সূত্রটি দাঁড়ায়– কারণ-করণীয়-করণও ফলাফল। প্রত্যেক জাতির জীবনেই দুই সভ্যতার মাঝখানে বিরাজ করে যুগসন্ধি বা transition period. ঘাত-প্রতিঘাত ও সমঝোতা-সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে ঘটে সভ্যতার উদ্ভব, বিকাশ ও বিলয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে সভ্যতার পর সভ্যতা তরঙ্গিত গতিতে চড়াই-উতরাইয়ের ধারা ধরে গতিশীল থাকে। জাতীয় সংস্কৃতির বেলায়ও তাই দেখা যায়। এক সভ্যতার সঙ্গে অন্য সভ্যতার – এক সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির – মিলন-বিরোধ আছে।

প্রত্যেক জাতির জীবনে প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে কিছু সাধনা থাকে। সেই সাধনা নিয়েই সেই জাতির সেই যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। বাংলাভাষায় সভ্যতার রূপ ও প্রকৃতিকে আজো যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সঙ্কট প্রথম প্রকটিত হয়েছিল, মার্কসবাদ যে সঙ্কটের অবসান ঘটাবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, ইতিহাসের ধারায় অত্যুন্নত নতুন প্রযুক্তির বিস্তার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর যে সঙ্কট বহুগুণ গভীর ও বিস্তৃত হয়েছে, তা থেকে উদ্ধার লাভের জন্য নতুন সভ্যতা সৃষ্টিতে মনোযোগী হওয়া আজ প্রত্যেক জাতির এবং গোটা মানবজাতির একান্ত কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, সভ্যতা কেবল অতীতের ব্যাপার নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতেরও ব্যাপার। আর সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেবল চিন্তার ব্যাপার নয়, কাজেরও ব্যাপার।

৩. আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার বিলয় এবং নতুন সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়াস

আলবার্ট সুইট্জার (১৮৭৫– ?) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে রচিত তাঁর *The Decay and Restoration of Civilization* (ইংরেজি অনুবাদ ১৯২৩) গ্রন্থে civilization-এর ধারণা অবলম্বন করে ইউরোপীয় জাতি সমূহের মনোজীবনের ইতিহাস ও সার্বিক উত্থান-পতন ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে কোনো জাতির সার্বিক উত্থান ও সার্বিক পতনের অর্থ

হল সেই জাতির সভ্যতার উত্থান ও পতন। সভ্যতার মধ্যে মানবীয় সব মহৎ প্রয়াসই চলমান থাকে। নৈতিক চেতনাকে সুইট্‌জার সভ্যতার প্রাণশক্তি রূপে পেয়েছেন। নৈতিক ব্যাপারকে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয়, বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত, মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। মানুষের অন্তর্গত ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও উচিত-অনুচিতের বোধ এবং ভালো, ন্যায় ও উচিতের পক্ষ অবলম্বনের আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি নৈতিক চেতনা বলেছেন। কোনো জনগোষ্ঠীর বা জাতির নৈতিক চেতনা দুর্বল হয়ে গেলে সেই জনগোষ্ঠীর বা জাতির সভ্যতা ক্ষয় পেতে থাকে (*decline*)। পৃথিবীর সর্বত্র সব যুগে সব জনগোষ্ঠীর বা জাতির জীবনেই এমনটা ঘটে। প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায়, যাঁরা সামাজিকভাবে সক্রিয় এবং ন্যায় ও সর্বজনীন কল্যাণকে অধিক গুরুত্ব দেন, তাঁদের সঙ্গে যারা হীন-স্বার্থন্বেষী ও কায়েমি স্বার্থবাদী, তাদের বিরোধ চলে। এই বিরোধে যাঁরা ন্যায়কামী ও সর্বজনীন কল্যাণের পক্ষপাতী তাঁরা যখন ক্ষমতাসীন থাকেন তখন সভ্যতা বিকাশশীল থাকে, আর যখন হীন-স্বার্থন্বেষী ও কায়েমি-স্বার্থবাদীরা প্রাধান্য বিস্তার করে ও ক্ষমতায় থাকে তখন সভ্যতা লয় পেতে থাকে এবং বর্বরতা প্রবল হতে থাকে। যখন কোনো জাতির মধ্যে নতুন চিন্তাধারা, কর্মধারা ও নৈতিক চেতনা দেখা দেয়, তখন সেই জাতির মধ্যে নতুন সভ্যতার উন্মেষ বা সূচনা ঘটে। সভ্যতা ও বর্বরতার মধ্যে ধারাবাহিক বিরোধ ও সংগ্রাম চলে। ব্যক্তিমানুষের অন্তরেও এই বিরোধ ও সংগ্রাম থাকে। সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সভ্যতার উপাদানের সঙ্গে বর্বরতার উপাদানও যুক্ত থাকে, কিংবা বর্বরতার উপাদানের সঙ্গে সভ্যতার উপাদানও যুক্ত থাকে। সেজন্য সভ্যতার প্রক্রিয়া জটিল। সুটট্‌জার লক্ষ করেছেন, উনিশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের জাতিসমূহের জীবনে রেনেসাঁসের উত্তাপ ছিল, বিশ শতকে এসে তারা সে উত্তাপ হারিয়ে নৈতিক বিপর্যয়ে পড়েছে, সর্বত্র দেখা দিয়েছে অবক্ষয়। বিশ্বযুদ্ধের কালে সুইট্‌জার তাঁর চতুষ্পার্শ্বে দেখতে পান বর্বরতা সক্রিয়, মনুষ্যত্ব নিষ্ক্রিয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল উন্নতির মধ্যে সভ্যতা ক্ষয় পেয়ে যাচ্ছে এবং বর্বরতা কর্তৃত্বশীল হচ্ছে দেখে তিনি বিচলিত হন। তিনি নৈতিক বিকার ও সভ্যতার পতন থেকে ইউরোপের জাতিসমূহকে উদ্ধার করার জন্য নতুন সভ্যতা সৃষ্টির উপায় খুঁজেছেন। চতুষ্পার্শ্বের বিরাট-বিপুল পতনশীলতা ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও মানুষের উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। পতিত ও পতনশীল মানুষের মধ্যে তিনি নবউত্থানের সম্ভবনা দেখেছিলেন, এবং তাদের তিনি উঠতির ধারায় উত্তীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁসের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় মাঝে মাঝেই দেখা দিয়েছে সমস্যা। সেসব সমস্যা অতিক্রম করে ইউরোপ চলেছিল রেনেসাঁসেরই ধারা ধরে। কিন্তু বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই ইউরোপ বিচ্যুত হয়ে পড়ে রেনেসাঁসের ধারা থেকে, এবং সমস্যা পরিণত হয় নজিরবিহীন সঙ্কটে। সেজন্যই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকেরা তখন চরম উদ্বেগের সঙ্গে সঙ্কটমুক্তির উপায় সন্ধানে তৎপর হন। বিষয়টিকে তাঁরা দেখেন সভ্যতার বিলয় ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করার সমস্যা রূপে। সভ্যতাকে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার মনে না করে ভেবেছেন মানুষের প্রয়াসসাধ্য ব্যাপার। সুইট্‌জার রেনেসাঁসের ইতিহাস গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং লক্ষ করেছেন, উনিশ শতক পর্যন্ত ইউরোপের জাতি সমূহের মধ্যে রেনেসাঁসের স্পিরিট বহমান ছিল। শেষ দিকটায় অবক্ষয় সূচিত হয় এবং কিছু অবশেষ টিকে থাকলেও সাধারণভাবে সভ্যতার বিলোপ ঘটে। এ-অবস্থায় নতুন রেনেসাঁসের উন্মেষ ও নতুন সভ্যতা সৃষ্টি ছিল সুইট্‌জারের অভীষ্ট।

ইউরোপের সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের জন্য তিনি বিবেকবান, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতি নতুন নতুন রেনেসাঁস সৃষ্টির আবেদন জানান, আগেকার রেনেসাঁসের পুনরুজ্জীবনের কথা তিনি ভাবেননি। তাঁর ধারণা ছিল নতুন রেনেসাঁসের স্পিরিট অবলম্বন করে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি হবে। *আগেকার রেনেসাঁস ছিল মধ্যযুগের অন্যায় ও বর্বরতাকে পেছনে ফেলে আধুনিক যুগকে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত করার ব্যাপার; আর এবারের রেনেসাঁস হবে আধুনিক যুগের অন্যায় ও বর্বরতাকে পেছনে ফেলে প্রগতিশীল নতুন যুগ সৃষ্টির ও তাকে বিকশিত করার ব্যাপার।*

ওস্‌ওয়াল্ড স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬) দুই বিশ্বযুদ্ধের পর্বে ইউরোপের জাতিসমূহের অবস্থা দেখে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন এবং সঙ্কট থেকে মুক্তির উপায় খুঁজেছেন। তিনি *Decline of the West* গ্রন্থে (ইংরেজি অনুবাদ প্রথম খন্ড ১৯২৬, দ্বিতীয় খন্ড ১৯২৮) national culture-এর ধারণাকে অবলম্বন করে পাশ্চত্য জাতি সমসূহের জীবনধারার উত্থান-পতন ব্যাখ্যা করেছেন, এবং ইতিহাসের গতিধারার বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। কালচার ব্যাপারটিকে

তিনি উপলব্ধি করেছেন দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি, আবিষ্কার-উদ্ভাবন এবং রাজনীতি-অর্থনীতির অনুশীলন থেকে বিনোদন পর্যন্ত সকল মানবীয় চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে; কেবল নাচ-গান, কবিতা-নাটক ও বিনোদনের আয়োজন দিয়ে নয়। তাতেও সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি পেয়েছেন নৈতিক চেতনাকে। তিনিও নৈতিক চেতনাকে উপলব্ধি করেছেন বিজ্ঞানসম্মত যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এবং নৈতিক চেতনার প্রকাশ দেখেছেন মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক সকল কাজের মধ্যে। নৈতিক চেতনাকেই তিনি মনে করেছেন culture-এর প্রাণশক্তি। তাঁরও চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় ইউরোপের জাতিসমূহের পতনশীলতা থেকে উত্থানের ধারায় উত্তরণ। প্রভাবের পারস্পরিকতা সত্ত্বেও প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতিকে তিনি মনে করেছেন স্বতন্ত্র। মানবজাতির কল্যাণ ও উন্নতির জন্য বৈশ্বিক সংস্কৃতির মূলে জাতীয় সংস্কৃতিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ইউরোপের জাতি সমূহের বিদ্বৎসমাজকে রেনেসাঁসের স্পিরিট থেকে বিচ্যুত হতে দেখে এবং তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিশীল নতুন চিন্তার অভাব দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছেন। স্পেংলারের এ গ্রন্থের সূত্র ধরে ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় সভ্যতার সঙ্কট ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে আরো অনেক লেখকের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরণের জন্য স্পেংলারের লেখায় নৈতিক উজ্জীবন, সৃষ্টিশীলতা ও প্রগতির বিবেচনা গুরুত্ব পেয়েছে।

বিট্রিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড জে. টয়েনবি (১৮৮৯-১৯৭৫) ১৯৪০-এর ও '৫০-এর দশকে অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন। পরে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিদ্বৎসমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকেনি। বারো খণ্ডে রচিত *A Study of History* গ্রন্থে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের ২৬ টি সভ্যতার (historical entity) উত্থান-পতনের বিবরণ রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রতিটি সভ্যতার মর্মে তিনি স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন। বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাবও তিনি লক্ষ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী প্রতিটি সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ ঘটেছে সৃষ্টিশীল প্রভাবশালী সংখ্যালঘুদের নেতৃত্বে। তাঁর মতে, কোনো সভ্যতার ধারায় নেতৃত্ব যখন সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলে, নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়, শাসক সম্প্রদায় স্বেচ্চাচারী ও অত্যাচারী হয়ে ওঠে, তখনই সেই সভ্যতার পতন ঘটে। কর্তৃত্ববাদ, যুদ্ধবাদ, পুজিবাদ ও জাতীয়তাবাদকে তিনি সভ্যতাবিধ্বংসী মনে করেছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ঠিক ছিল না। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও বিকার আছে। উপনিবেশবাদ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ, জাতীয়তাবাদের বিকার – স্বাভাবিক বিকাশ নয়। জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। তাঁর রচনাবলি বিবেচিত হয়েছে 'commercial and academic phenomenon' রূপে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটিশ ফরেন অফিসে গোয়েন্দা বিভাগে চাকুরি করেছেন। পরে নানা কূটনৈতিক কাজে নিয়োজিত থেকেছেন। তবে কর্মজীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আরো দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নানা বিষয়ে তাঁর কিছু বই আছে। সেগুলোতে তাঁর চেষ্টা ছিল সমকালীন উত্তেজনা প্রশমন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা।

অহিংসা, সত্যাগ্রহ, সর্বোদয় ও অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে মানবজাতির জন্য উন্নত নতুন ভবিষ্যত সৃষ্টির যে চেষ্টা মহাত্মা গান্ধি করে গেছেন, তাও নতুন সভ্যতাভিলাষীদের গুরুতর বিবেচনা দাবি করে। গান্ধি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের নৈতিক উন্নতিতে। গান্ধির রচনাবলিতে রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ থাকলেও প্রগতিশীলদের জন্যও তাতে রয়েছে অমূল্য সব চিন্তার খোরাক। তাঁর সত্যাগ্রহ, অহিংসা, সর্বোদয় ও অসহযোগ নতুন সভ্যতা সৃষ্টির মূলগত অবলম্বন হতে পারে।

মার্কস, এঙ্গেলস, লেলিন, স্টালিন ও মাও সেতুঙের রচনাবলি ও অভিজ্ঞতাও নতুন সভ্যতাভিলাষীদের অবশ্যবিবেচ্য। মার্কসবাদ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক উন্নতিতে। মনের দিকটা বহুলাংশে বিবেচনার বাইরে থেকে গিয়েছে। স্বাধীন চিন্তাশীলতা যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

সিগমান্ড ফ্রয়েড, বার্ট্রান্ড রাসেল, পিতিরিম সরোকিন, এরিখ ফ্রোম প্রমুখ মনীষীও পাশ্চাত্য সভ্যতার দুর্গতি দেখে বিচলিত হয়েছেন এবং উত্তরণের উপায় সন্ধান করেছেন। দুই বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন পাশ্চাত্য সভ্যতার (বর্বরতার!) কঠোর সমালোচনা তাঁরা করেছেন। ফ্রোম চেষ্টা করেছেন মানবজাতির প্রগতির জন্য মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার সমন্বয় (synthisis) সাধন করতে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, তাঁর মৃত্যুর

(১৯৪১) ঠিক আগে রচিত 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে ইউরোপের তখনকার সভ্যতার (বর্বরতার!) প্রতি চরম অনাস্থা ব্যক্ত করে প্রাচ্য থেকে নতুন মহামানবেরও নতুন সভ্যতার উত্থান আশা করছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখাটিতে গভীর ইতিহাসচেতনার পরিচয় আছে। তবে ইউরোপে সভ্যতার সঙ্কট কেন দেখা দিয়েছে এবং প্রাচ্য থেকে নতুন মহামানব ও নতুন সভ্যতার উদ্ভব কেন কীভাবে ঘটবে সে সম্পর্কে তিনি কিছু উলেখ করেননি। রবীন্দ্রনাথের লেখাটি confessional – সারা জীবন ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে যে ভূমিকা তিনি পালন করেছেন সে সম্পর্কে জীবনসায়াহ্নে দেশবাসীর ও বিশ্ববাসীর উদ্দেশে আত্মপক্ষ সমর্থন মূলক কিছু কথা তিনি বলে গেছেন। সেই সূত্রেই সভ্যতার সঙ্কট সম্পর্কে নিজের উপলব্ধি তাঁকে ব্যক্ত করতে হয়েছে। প্রথমে Crisis of Civilization পরে Crisis in Civilization নামে লেখাটির ইংরেজি রূপও তিনি রেখে যান।

ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ক্লাইভ বেল দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে মানুষের অন্তর্গত মানবীয় বৃত্তির পড়তি ও পাশবিক বৃত্তির উঠতি লক্ষ করে বিচলিত হন। ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে তিনি লক্ষ করেন বর্বরতার উত্থান ও সভ্যতার পতন। সে অবস্থায় ইউরোপের জাতি সমূহকে বর্বরতার ধারা থেকে সভ্যতার ধারায় উন্নীত-করার উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেন *Civilization* গ্রন্থটি। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বর্বরতার উত্থান ও সভ্যতার পতন প্রথমে দেখা দেয় শাসক শ্রেণিতে এবং ক্রমে তা জনসাধারণের পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। সভ্যতার পতনের সময়ে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ক্ষমতাবান, ক্ষমতাহীন, শক্তিমান, দুর্বল সকলেই মানবিক গুণাবলি হারাতে থাকে। সমাজে ব্যক্তির আত্মসম্মানবোধ ও সৎসাহসের অভাব দেখা দেয়। সর্বজনীন কল্যাণের চিন্তা অবহেলিত ও নির্জিত হতে থাকে। সমাজে যার ক্ষতি করার শক্তি যত বেশি হয়, তার প্রভাব-প্রতিপত্তি তত বাড়ে আর মানুষের কল্যাণ করার শক্তি কোনো শক্তি বলেই স্বীকৃত হয় না। ফলে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করতে চায়, তারা মানুষের ক্ষতি করার শক্তি অর্জনে সচেষ্ট থাকে। সমাজে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষের পরস্পরিক সম্পর্কে শিথিলতা (alienation / estrangement) দেখা দেয়। *সাহস হল সেই মানবিক গুণ যা অন্য সব মানবিক গুণকে রক্ষা করে। সমাজে সাহসের অভাব দেখা দিলে সব মানবিক গুণই লোপ পেতে থাকে।* সাহসের মূলে থাকে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা। সভ্যতার পতনের কালেও সমাজে প্রতিবাদী চেতনা থাকে। মূলবোধ ও যুক্তি অবলম্বন করে চলার চেষ্টাও থাকে। তবে সমাজে সেগুলো গুরুত্ব পায় না। সার্বিক অবক্ষয় ও পতনশীলতার মধ্যে সমাজে প্রায় সকলেই দৌরাত্মপরায়ণদের মেনে চলে। গোটা সমাজে ও রাষ্ট্রে অন্যায়কারীদের কর্তৃত্ব কায়েম হয়। ক্লাইভ বেল সভ্যতার স্বরূপ এবং বর্বরতা ও সভ্যতার পার্থক্য স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিমানুষকে তিনি দেখেছেন সবকিছুর মূলে। ব্যক্তির গুণাবলিতে তিনি সভ্যতার ভিত্তি পেয়েছেন। তিনি ধারণা করেছেন যে, বর্বরতা ও সভ্যতার মর্মপরিচয় জানলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বর্বরতা ছেড়ে সভ্যতার পথ ধরবে। মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসও তখন সভ্যতাভিমুখী হবে। মানুষের মহত্ত্বের প্রতি তাঁর ছিল অন্তহীন আস্থা। তিনি ব্যক্তিমানুষকে ভেতর থেকে ভালো করে তোলার চেষ্টা করেছেন – মনে করেছেন ব্যক্তিমানুষেরা ভালো হয়ে উঠলে সমাজ ও রাষ্ট্র ভালো হবে। তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের উন্নত চিন্তা-চেতনাই কোনো জাতির বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণের প্রথম ধাপ।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিতে ক্লাইভ বেলের উক্ত গ্রন্থ অবলম্বন করে বাংলায় রচনা করেন *সভ্যতা*। বাঙালি হিংসা-প্রতিহিংসা ও দাঙ্গার বর্বরতা ছেড়ে সভ্য হয়ে উঠুক, তার মানসিক উন্নতি দেখা দিক, তার অন্তর্গত মানবিক গুণাবলি বিকশিত হোক – এটাই ছিল তাঁর একান্ত কামনা। তাঁর মৃত্যুর (১৯৫৯) ছয় বছর পর, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এসব লেখা নিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় সভ্যতা (১৯৬৫)। এর আগে মোহিতলাল মজুমদারও 'আত্মবিস্মৃত, আত্মভ্রষ্ট, আত্মঘাতী' বাঙালির উন্নতির আশায় ক্লাইভ বেলের এই বইটি 'সভ্যতা' নামে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন এবং তাঁর সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সেটি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোনো জাতির মানসিক উন্নতি হলে তার কর্মও উন্নত হয় – ক্রমে সবকিছুই উন্নতির ধারায় উত্তীর্ণ হয়।

ওই সময়টাতে হিন্দু-মুসলমানের সহিংস বিরোধ আর সাহিত্য ও শিল্পকলায় আধুনিকতাবাদীদের (modernists) নৈরাশ্যবাদ ও কলাকৈবল্যবাদের চর্চা দেখে বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মর্মাহত হয়েছিলেন।

১৯৬০-এর দশকের শেষদিকে পশ্চিমবাংলায় দেখা দেয় নকশালপন্থী আন্দোলন ও শ্রেণিশত্রু খতমের কার্যক্রম, এবং তার প্রভাব পড়ে পূর্ববাংলায়ও। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার আন্দোলনরত জনগণের উপর চালায় সর্বাত্মক সামরিক আক্রমণ এবং সংঘটিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। এসবের মধ্যে সুইটজার, স্পেংলার ও ক্লাইভ বেলের চিন্তার প্রভাব বাংলার বিদ্বৎসমাজে অল্পই পড়েছে। উনিশশ ষাটের, সত্তরের ও আশির দশকে এখানে বৈপ্লবিক আবেগ ও সরকার উৎখাতের আন্দোলনের উত্তাপ ছিল খুব বেশি, তখন স্থিতধী চিন্তক কমই ছিলেন – দূরদর্শী চিন্তাও ছিল না। এই আবেগপর্বের আগে শতাব্দীব্যাপী বাঙালি চিন্তকদের মধ্যে সুগভীর দূরদর্শী চিন্তা ছিল – স্থিতধী চিন্তকও ছিলেন, সেটা ছিল এক রেনেসাঁসের কাল। রেনেসাঁসের অভিব্যক্তি গণজাগরণের মধ্যেও ছিল।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের *Kalki or the Future of Civilization* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে, ইংল্যান্ডের Today and Tomorrow সিরিজে। ১৯৪৮ সালে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় মুম্বাইয়ের হিন্দ কিতাব নামক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য, আমি পাইনি। ১৯৬০ সালে ভারত সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা বিভাগ দিল্লি থেকে বাংলা অনুবাদে এটি প্রকাশ করে *কল্কি অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ* নাম দিয়ে। হয়তো তখন ভারতের পনেরোটি জাতীয় ভাষায়ই এটি অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়েছে। মীনাক্ষি দত্তের বাংলা অনুবাদ সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও এতে রয়েছে সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গির, গভীর অন্তর্দৃষ্টির ও বিপুল প্রজ্ঞার পরিচয়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সভ্যতার উপর প্রযুক্তির অভিঘাত, ধর্মে আস্থাহীনতার প্রসার, পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতা, প্রচলিত মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার ক্ষীয়মাণতা এবং নতুন মূল্যবোধ ও নৈতিক চেতনার অভাব, পাশ্চাত্য রাজনীতির অধোগতি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, অবাধপ্রতিযোগিতাবাদের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবনপ্রণালির বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সমস্যা, বৃহৎ শক্তিবর্গের অন্তহীন আধিপত্যলিপ্সা ও আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ, গণতন্ত্রের নামে ভোগবাদ ও অনাচার, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের ব্যাপ্তি সত্ত্বেও যুদ্ধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি, উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কালেও মানবস্বভাবের জটিলতা বৃদ্ধি ও মানুষের মধ্যকার পশুশক্তির দ্রুত বিকাশ ইত্যাদি তিনি ক্ষুদ্র পরিসরে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির শেষাংশে রাধাকৃষ্ণণ বিজ্ঞানের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের আবহে গোটা মানবজাতির সভ্যতার সঙ্কটের স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন এবং নতুন সভ্যতায় উত্তরণের উপায় সন্ধান করেছেন। সেখানে তাঁকে পাওয়া যায় রক্ষণশীল রূপে। ধর্ম, নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও পরিবার, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক ও যুদ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মতামত একালের কোনো প্রাজ্ঞজনের মনোমুগ্ধকর ভাষায় ব্যক্ত প্রাচীন কালের কোনো স্থিতধী সংস্কারপ্রয়াসী ঋষির ভাবধারার তুল্য। তাঁর বক্তব্য ও বর্ণনা আবেদনঋদ্ধ, তাতে কোথাও বিন্দুমাত্র জবরদস্তি কিংবা উগ্রতা নেই। রাধাকৃষ্ণণ রক্ষণশীল। রক্ষণশীলেরা সাধারণত প্রগতির ধারায়ই চলতে চান, তবে মন্থর গতিতে। আর প্রতিক্রিয়াশীলেরা হীনস্বার্থবুদ্ধি ও কায়েমিস্বার্থবোধে তাড়িত হয়ে প্রগতিশীল যে-কোনো-কিছুকে বাধা দেয়। রাধাকৃষ্ণণের দৃষ্টিভঙ্গি সদর্থক, মানুষের উপর তাঁর গভীর আস্থা আছে এবং সভ্যতার ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। প্রগতিশীলেরা তাঁর লেখায় চিন্তার উদ্দীপক পেতে পারেন।

আবু সয়ীদ আইয়ুবের *আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮)* এবং *Poetry and Truth* গ্রন্থ দুটিতে দুই বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের বাঙালিকে এবং বিশ্ববাসীকে নৈরাশ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করার ও রক্ষা করার কার্যকর চেষ্টা আছে। আধুনিকতাবাদের *(modernism)* সমালোচনা আর গঠনমূলক দূরদর্শী নতুন চিন্তার আধার হিসেবে দুটি গ্রন্থই অত্যন্ত মূল্যবান। আবু সয়ীদ আইয়ুবের অভিপ্রায় সঙ্কট অতিক্রম করে মানুষের সুস্থ ধারায় সামনে চলা বা প্রগতি। সভ্যতার সঙ্কট ও উত্তরণের সম্ভাবনাকে বোঝার জন্য তাঁর আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটিও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় সভ্যতার সঙ্কট ও উত্তরণের উপায় বিষয়ে বহু লেখকের অনেক বই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার দেখে দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-চিন্তকেরা বিচলিত হয়েছেন বটে, তবে বিজ্ঞানের প্রয়োগকেই তাঁরা মানবিক করতে চেয়েছেন। এরই মধ্যে

ঘটেছে রুশ বিপ্লব (১৯১৭), চিনবিপ্লব (১৯৪৯) এবং উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা অর্জন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর থেকে সাম্রাজ্যবাদের বা নয়াউপনিবেশবাদের শক্তি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামও শক্তিশালী হতে থাকে। এরই মধ্যে বিকশিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক শিবির। সমাজতন্ত্রীরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলতে পারেনি।

আধুনিক যুগের বাঙালি চিন্তকেরা ইউরোপের রেনেসাঁসের স্পিরিটকে আত্মস্থ করে বাংলা ভাষায় জাগরণ, নবজাগরণ, নবচেতনা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, রেনেসাঁস প্রভৃতি ধারণা অবলম্বন করে, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ধারায় এগিয়ে চলেন। পরবর্তীকালের চিন্তকেরা রেনেসাঁসের উপলব্ধি নিয়ে সম্মিলিত জীবনধারার ইতিহাস ও উত্থান-পতনকে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, এবং অবক্ষয় ও পতনশীলতা থেকে উত্থানের উপায় সন্ধান করেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের (১৯৯১) পরে, ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সবকিছু রূপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের অভিপ্রায় অনুযায়ী। গোটা পৃথিবী জুড়েই এখন এমনটা চলছে। বাংলাদেশে এবং গোটা পৃথিবীতে চিন্তা ও অনুভূতির জগতে যেসব প্রবণতা কর্তৃত্ব বিস্তার করে চলছে যে দেখা দিয়েছে এক counter-renaissance। কোনো ঘোষণা না দিয়ে counter-renaissance-এর ভাবুক ও কর্মীরা কায়েমি-স্বার্থবাদীদের পক্ষ নিয়ে renaissance-এর বিরোধী চিন্তা ও কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁরা-যে রেনেসাঁসের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যেতে চান, তা নয়। তাঁরা মানবজাতিকে নিয়ে যান শূন্যবাদের (nihilism) কিংবা নৈরাশ্যবাদের (pessimism) দিকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর পশ্চিমা বিশ্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারায় গণবিরোধী চিন্তার জোয়ার দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশ চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচলনায় বিশ্বায়নের ধারা ধরে। বিশ্বায়ন তো সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকেই এগিয়ে নেওয়ার নামান্তর। যে অবস্থা চলছে তাতে গ্রেকো-রোমান-ইউরো-আমেরিকান সভ্যতার প্রগতিশীল মহান ভাবধারা আর সৃষ্টিশীল প্রগতিশীল দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শিল্প-সাহিত্য অবহেলিত। grand narrative ও master discourse বলে সেগুলোকে খারিজ করে দেওয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় সভ্যতা বিষয়ে আমাদের এই আলোচনা বর্বরতার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের দাবিতে, সর্বজনীন কল্যাণের আশায় – কেবল উচ্চশ্রেণির নিতান্ত স্বল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থে নয়। *আগেকার রেনেসাঁস ছিল মধ্যযুগের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও অন্যায় অবিচারের অবসান ঘটিয়ে নতুন মানববিশ্ব গড়ে তোলার জন্য; আগামী রেনেসাঁস হবে আধুনিক যুগের ভুল চিন্তা, কায়েমি স্বার্থবাদ, অন্যায়-অবিচার ও যুদ্ধ-বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে নতুন বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য।*

৪. সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ও বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠনে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের (১৯৯১) পরেই যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বগ্রাসী বিশ্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকাশিত হয় দুটি গ্রন্থ : ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার *The End of History and the Last Man* (১৯৯২) এবং স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের *The Clash of Civiliazations and the Remaking of World Order* (১৯৯৩)। গ্রন্থ দুটি পরস্পর সম্পূরক। দুজন লেখকই ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং রাষ্ট্রপতির পরামর্শক। গ্রন্থ দুটিতে রয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নবায়নের লক্ষ্যে লেখকদের গভীর তাত্ত্বিক চিন্তা ও পরিকল্পনা। তীব্র প্রতিযোগিতার (cold war) মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে আশাবাদ, তারই সুচিন্তিত, দূরদর্শী অভিব্যক্তি রয়েছে গ্রন্থ দুটিতে।

ফুকুইয়ামা বোঝাতে চেয়েছেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের মার্কসীয় ধারণার এবং মানবজাতির ভবিষ্যত নির্ধারণে মার্কসবাদীদের সমস্ত আয়োজনের চিরঅবসান ঘটে গেছে। ইতিহাসের মার্কসীয়

ধারণাকে যুক্তি দিয়ে খারিজ করে দিয়ে তিনি চেয়েছেন মানবজাতিকে পুঁজিবাদে আকৃষ্ট করতে। পুঁজিবাদের মনস্তত্ত্বের গভীরে তিনি দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছেন। মানবজাতির আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক অগ্রগতির ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন মানুষের পুঁজিবাদী প্রেষণার সূত্র ধরে। মানুষকে solitary, poor, nasty, brute and short বলে মানবপ্রকৃতির যে বর্ণনা হব্‌স্‌ দিয়েছিলেন, তার সূত্র ধরে নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী তিনি পুঁজিবাদের অনুকূলে মানবপ্রকৃতির স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক প্রেষণার কিংবা সমাজতন্ত্রের মনস্তত্ত্বের দিকে তিনি দৃষ্টি দেননি। তাঁর বিবেচনায় মানুষ স্বভাবত পুঁজিবাদী। সভ্যতার বিকাশধারায় পুঁজিবাদী প্রেষণার শক্তিকে তিনি অপ্রতিরোধ্য ও অন্তহীন বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যবস্থার পুনর্গঠন তিনি আকাঙ্ক্ষা করেছেন ইতিহাসের পুঁজিবাদী ধারণা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী – পুঁজিবাদ ও উদার গণতন্ত্রের পথ ধরে। মানুষ জন্মগতভাবে অসমান (inherently unequal)– এই কথাটিতে তিনি জোর দিয়েছেন। মার্কসীয় জীবনজগতদৃষ্টির বিপরীত মেরুতে অবস্থান নিয়ে তিনি চিরকালের কায়েমি স্বার্থবাদীদের দিক থেকে মানবজাতির অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কথা ভেবেছেন। দুর্বলের উপর শক্তিমানের শোষণ-নির্যাতন এবং তা থেকে দুর্বলের মুক্তির উপায় সম্পর্কে ফুকুয়ামা চিন্তা করেননি। দুর্বলের ভাগ্য নির্ভর করে প্রবলের সদয় বিবেচনার উপর।

হান্টিংটন ধর্ম, মতাদর্শ ও সংস্কৃতিকে মনে করেছেন ইতিহাসের নিয়ামক ও সভ্যতার মর্মবস্তু। বিভিন্ন সভ্যতার ধর্মভিত্তিক ও মতাদর্শগত পারস্পরিক বিরোধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তিনি অবলোকন করেছেন মানবজাতির অগ্রযাত্রার ইতিহাস। অর্থনৈতিক ভিত্তি ও স্বার্থগত বিষয়কে তিনি কম গুরুত্ব দিয়েছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর চলমান মানবতিহাসে তিনি লক্ষ করেছেন কনফুসীয় মতবাদ, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম ও ইহুদিধর্মকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সভ্যতার পারস্পরিক বিরোধ। বিরোধের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ইসলাম ও মুসলমানদের ভূমিকা। মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীরা গুরুত্ব পায়নি। তাঁর চোখে সশস্ত্র ইসলামি মৌলবাদীদের উত্থান মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ রূপে দেখা দিয়েছে। ১৯৮০-র দশকে সশস্ত্র ইসলামি মৌলবাদের উত্থান কেন কীভাবে সূচিত হয়েছে,সে প্রশ্নে তিনি যাননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারটি তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র রয়েছে তাঁর বিবেচনার আওতায়। তবে শেষ পর্যন্ত সবকিছুকেই তিনি নিয়ে গেছেন পুঁজিবাদের অনুকূলে। বিভিন্ন সভ্যতার বিরোধের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের ধারায় ভবিষ্যত সভ্যতার সম্ভাব্য বিকাশ তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী মানবজাতির চিরন্তন অন্তর্নিহিত প্রবণতা পুঁজিবাদের দিকে। মাও সেতুঙের চিন্তাধারার স্থূলাভিষিক্ত করে কনফুসীয় মতবাদের কথা তিনি যেভাবে বলেছেন, তা স্বকপোলকল্পিত – wishful. কথিত উদার গণতন্ত্র বা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী গণতন্ত্রকেই তিনি মানবজাতির ভবিষ্যতের একমাত্র অবলম্বন মনে করেছেন। এতে একদেশদর্শিতা আছে। ফুকুইয়ামার চিন্তাধারাও একদেশদর্শী। একমাত্র পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী উন্নয়নতত্ত্বকেই তাঁরা মনে করেছেন উন্নয়নের বিবেচনাযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য অবলম্বন। মানুষ সম্পর্কে দুজনের ধারণাই পক্ষপাতদুষ্ট – একদেশদর্শী। তাঁরা কেবল অসাম্য দেখেছেন, অসাম্যের প্রকৃতি ও প্রক্রিয়া তাঁরা তলিয়ে দেখতে চাননি। পুঁজিবাদের পক্ষ নিয়ে তাঁরা প্রাকৃতিক অসাম্যের উপর মানবসৃষ্ট অসাম্যের শুভাশুভ লক্ষ্যই করেননি। বিপুল অধিকাংশ মানুষ যে দুর্বল, তারা যে স্বল্পসংখ্যক প্রবল দ্বারা শোষিত নির্জিত, প্রবলদের উদ্দেশ্যসাধনের অবলম্বন – এটা তাঁরা বিবেচনা করেননি। দুর্বলদের মুক্তির উপায় তাঁরা পেয়েছেন শক্তিশালীদের দয়ার ও দানশীলতার মধ্যে। তাঁরা চিন্তা করেছেন প্রবলভাবে অর্থগৃধনু, ক্ষমতালিপ্সু শক্তিশালীদের পক্ষ অবলম্বন করে। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, উৎপাদনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা ও সম্ভাববনাকে তাঁরা অল্পই মূল্য দিয়েছেন। দুর্বলের শক্তিশালী হওয়া, প্রবলের দুর্বল হয়ে পড়া, গরিবের ধনী হওয়া, ধনীর গরিব হয়ে পড়া, দুর্বল ও গরিবের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা – এসব তাঁরা বিবেচনা করেননি। দুর্বলের ও গরিবের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা তাঁরা পেয়েছেন কেবল শক্তিমানের ও ধনীর সেবকত্বের মধ্যে। ধনিক শ্রেণির রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থার জায়গায় জনগণের গণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র (শতকরা পাঁচ ভাগের গণতন্ত্রের জায়গায় অবশিষ্ট শতকরা পাঁচনব্বই ভাগ সমেত শতভাগ মানুষের গণতন্ত্র) ও আন্তর্জাতিক

ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্রের ধারণা তাঁদের উপলব্ধিতে আসেনি। তাঁদের চিন্তা ধনিক-বণিক-শোষক-পীড়কদের পক্ষে একতরফা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিশ্বব্যবস্থা বিষয়ে ফুকুয়ামা-হান্টিংটননের পরিকল্পনার আগেই রোনাল্ড রেগান ও মার্গারেট থেচারের আমলে liberalism-এর নামে neoliberalism বাস্তবায়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল।

উনিশ ও বিশ শতকে অন্তত দেড়শ বছর ধরে পুঁজিবাদের যে সমালোচনা হয়েছে, তার সবই কি ভুল? মিথ্যা? neoliberalism কি আজ শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের জন্য উন্নত জীবনের কোনো নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছে? শক্তিশালী ও দুর্বল, শোষক ও শোষিত, জালেম ও মজলুম, স্বাধীন ও পরাধীন – এই কি চিরকালের জন্য মানবেতিহাসের নির্ধারিত ছক। যারা শোষিত, দরিদ্র, মজলুম ও পরাধীন, কোনো কালেই কি তারা উঠতে পারবে না? প্রকৃতি কি তাদের ভাগ্য চিরকালের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে? তারা কি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি করে শক্তিশালী হতে পারে না?

ক্লিনটন, বুশ, ওবামা, হিলারির নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী ফুকুইয়ামা ও হাটিন্টংটনের চিন্তাধারার বাস্তবায়ন চলছে। তার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সব রকম দুষ্কর্ম চালানো হচ্ছে। ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন চিন্তা, নতুন পরিকল্পনা, নতুন নতুন কর্মসূচি ও কর্মনীতি। পশ্চিমা বিশ্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় প্রবল জোয়ার দেখা দিয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্বে চলছে তারই অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ। কানাডা, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের শাসক শ্রেণি এই চিন্তাধারার অন্ধ অনুসারী। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপান চলছে এই ধারায় – যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রূপে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্টালিন, মাও সেতুঙ প্রমুখের চেতনায় একভাবে ধরা দিয়েছে, আর ফুকুইয়ামা-হান্টিংটনের চেতনায় অন্যভাবে ধরা দিয়েছে। আফগানিস্তানে, ইরাকে, লিবিয়ায় সামরিক আক্রমণ শুরু করার সময়ে জর্জ ওয়াকার বুশ ও বারাক ওবামা, হান্টিংটন ও ফুকুইয়ামার নাম উলেখ না করে তাঁদের উক্তি উদ্ধৃত করে, জাস্টিস প্রতিষ্ঠার কথা বলে আগ্রাসী যুদ্ধে বিশ্ববাসীর সমর্থন চেয়েছেন! জাস্টিস কী? বুশ-ওবামার জাস্টিসের ধারণা আর বিশ্বব্যাপী জনগণের জাস্টিসের ধারণা এক নয়। তাঁদের জাস্টিস জনগণের জন্য চরম ইনজাস্টিস। ফুকুইয়ামা ও হান্টিংটন দুজনই অগাধ পান্ডিত্য ও সুগভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। মনে হয়, উলিখিত দুটি গ্রন্থে তাঁরা যে চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণিরই বর্তমান ঐতিহাসিক কালের সকল চিন্তার ভিত্তি।

মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও মুক্তিকামী জনগণের দিক থেকে তাঁদের উক্ত চিন্তাধারার কার্যকর সমালোচনা কেউ করেননি। আর নতুন সভ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন বিশ্বদৃষ্টি গড়ে তোলার চেষ্টাও এখনো ধারাবাহিকতা পায়নি। সমাজতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু অবশেষ সমূহকে যাঁরা অন্ধভাবে ধরে আছেন, তাঁদের মধ্যে কোথাও নতুন বাস্তবতার প্রয়োজনে চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্গঠনের বা নবায়নের কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা আগেকার চিন্তাধারার প্রতি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর বিশ্বাস নিয়ে চলছেন। তাঁরা বুঝতে চান না যে, বিশ্বাসের দৃঢ়তা দিয়ে সত্যের প্রমাণ হয় না। বিশ্বাস মিথ্যা কিংবা ভুলকে অবলম্বন করেও দৃঢ় হতে পারে। বিশ্বাস অন্ধ হতে পারে। জনগণের গণতান্ত্রিক আদর্শের (শতকরা পাঁচ ভাগের গণতন্ত্রের জায়গায় অবশিষ্ট শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সমেত সকলের গণতন্ত্র) কিংবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পুনর্গঠনের ও নবায়নের কোনো প্রয়াস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। হান্টিংটনের বইটি নিয়ে যেসব আলোচনা-সমালোচনা লক্ষ করি, সেগুলোকে মনে হয় তাঁর চিন্তাধারার অনুকূলে পাতানো খেলা। ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে চলমান বিশ্বায়নের ভিত রচনায় ফুকুইয়ামার বইটিকে মনে হয় বেশি কার্যকর। কিন্তু সেটি নিয়ে আলোচনা কম।

ফুকুইয়ামা ও হান্টিংটননের বই দুটো নিতান্তই তাঁদের ব্যক্তিগত প্রয়াসের ফল নয়, তাঁদের পেছনে ছিল বিপুল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন। উলিখিত দুটি বই ছাড়া তাঁদের আর কোনো বই বা লেখা এমন সুলিখিত ও প্রভাবশালী হয়নি। এঁরা কি আলবার্ট সুইট্জার, ওস্ওয়াল্ড স্পেংলার, সিগমান্ড ফ্রয়েড, বার্ট্রান্ড রাসেল, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, গর্ডন চাইল্ড, আলবার্ট আইনস্টাইন, জাঁ পল সাঁর্ত, এরিখ ফ্রোম প্রমুখের পর্যায়ের চিন্তক?

ফুকুয়ামা ও হান্টিংটনের বই দুটো পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার ধারায় দুটি ক্লাসিক। বর্তমান বিশ্বকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারায় বিকশিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ফুকুইয়ামা-হান্টিংটনে আবদ্ধ নেই। যুক্তরাষ্ট্র সর্বশক্তি দিয়ে তাঁদের চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে বিকশিত করে চলছে।

মুহম্মদ ইউনূসের ক্ষুদ্র ঋণ ও সামাজিক ব্যবসার তত্ত্বও পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের চিন্তাধারা ও কর্মধারার ভেতর থেকে উদ্ভূত ও বিকশিত। মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁকে পেয়েছে নিজেদের কর্মধারায় এক অসাধারণ কর্মবীর রূপে। তারা তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনেকদিন ধরে তাঁকে তৈরি করে নিয়েছে। ইউনূস নিজেও সাগ্রহে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হয়েছেন। গত তিরিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতরা গ্রামীণ ব্যাংক, দরিদ্র মেয়েদের নিয়ে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, সামাজিক ব্যবসা ও ইউনূসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সামাজিক ব্যবসার তত্ত্ব আসলে সিভিল সোসাইটি ও এনজিও বিষয়ক তত্ত্বেরই নামান্তর। ২০০৬ সালে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অসাধারণ অগ্রগতি সাধনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক ও ইউনূসকে এক সঙ্গে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমা বৃহৎ শক্তিবর্গের শক্তিশালী সব প্রচারমাধ্যম নিরন্তর প্রচার দিয়ে ইউনূসকে কল্পিত এক ঊর্ধ্বলোকে উন্নীত করেছে। তারা তাঁকে মানুষ রাখেনি, অতিমানুষে পরিণত করেছে, আর তিনি নিজেও নিজেকে অতিমানুষ ভেবে গর্ব অনুভব করছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারের দিক থেকে এত সমর্থন আর কে কবে লাভ করেছেন? মনে হয়, ইউনূস এখন সাম্রাজ্যবাদী মহলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত, সবচেয়ে কার্যকর, শক্তিশালী মুখপাত্র। ফুকুইয়ামা ও হান্টিংটনের চিন্তা তাত্ত্বিক, ইউনূসের চিন্তা ব্যবহারিক। যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত ইউনূসের লেখা *Social Busines : the New Kind of Capitalism that Serves Humanity's Most Pressing Needs* (২০১০) বইটি পশ্চিমা বিশ্বে এখন সবচেয়ে বাজারসফল বইগুলোর একটি বলে কথিত। এ বইতে তিনি পুঁজিবাদকে রক্ষা করার মানসিকতা নিয়ে, ধনিক-বণিকদের, অন্য সবার মতোই, multidimentional beings রূপে দেখিয়েছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হার্বার্ট মার্কুজের *One Dimentional Man* (১৯৬৪) গ্রন্থটি তখনকার আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় মানবীয় সঙ্কট ও মানবচরিত্রের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য পৃথিবীর বিদ্বৎসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। মার্কুজ স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছিলেন। মানবিক বিপর্যয়ে তিনি বিচলিত হয়েছিলেন এবং উত্তরণের উপায় খুঁজেছিলেন। ইউনূস মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে, বিশেষ করে ধনিক-বণিকদের প্রকৃতি ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে, প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন চাইছেন। বক্তৃতায় তিনি বলে থাকেন যে, তাঁর প্রস্তাবিত নতুন ধরনের পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দারিদ্র্য চিরকালের জন্য অতীতের ব্যাপারে, ইতিহাসের বিষয়ে, মিউজিয়ামের সামগ্রীতে পরিণত হবে। পূর্বোক্ত গ্রন্থে মানবচরিত্র ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে ইউনূস লিখেছেন :

"The biggest flaw in our existing theory of capitalism lies in its misinterpretation of human nature. In the present interpretation of capitalism, human beings engaged in business are portrayed as one dimentional beings whose only mission is to maximaze profit. Humans supposedly pursue this economic goal in a single-minded fashion. This is a badly distorted picture of a human beings. As even a moment's reflection suggests, human beings are not money-making robots. The essential fact about humans is that they are multidimentional beings. Their happiness comes from many sources, not just from making money."

মানবচরিত্র ও পুঁজিবাদ সম্পর্কে ইউনূসের মত ঠিক হলে ভালোই হত। human nature, the nature of man, the concept of man দর্শনে আলোচিত সমস্যা। যত অনুসন্ধান ও আলোচনাই করা হোক, আরো অনুসন্ধান ও আরো আলোচনার সুযোগ থাকে – প্রয়োজনও থাকে। কোন উদ্দেশ্যে আলোচনা, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্দেশ্যর বিভিন্নতা অনুযায়ী অনুসন্ধানের ধরন ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজিবাদী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত লোকদের আচরণে ইউনূস যুগপৎ স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা লক্ষ করেন। তাঁর পরার্থপরতার দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে charity, philanthropy ও altruism-এর কথা। এসব নতুন নয়, অতি পুরাতন। পুঁজিবাদী ধারায় মানবজাতির উন্নত ভবিষ্যত সৃষ্টি ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য তিনি ধনিক-বণিকদের দানশীলতা, জনহিতকর কর্মকাণ্ড ও পরার্থবাদের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ধনিক-বণিকদের

দানশীলতা ও মহানুভবতায় সম্পূর্ণরূপে আস্থাশীল। আত্মস্বার্থমুক্ত মুনাফাবিহীন যে সামাজিক ব্যবসার কথা তিনি বলেছেন, তার দৃষ্টান্ত, তাঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সমূহ। ইউনূস চিন্তা করেছেন কেবল আমেরিকারই নয়, আমাদের দেশেরও, এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সমূহেরই প্রচলিত চিন্তা ও কার্যপ্রণালির ধারায়। সিভিল সোসাইটি হল বুদ্ধিজীবীদের এনজিও। বাংলাদেশে এগুলো চলে বিদেশি অনুদান নিয়ে। মানবজাতিকে দরিদ্র্যমুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখাবার জন্য ইউনূস মুনাফাবিহীন সামাজিক ব্যবসার কথা বলেছেন – যে ব্যবসা এনজিওরা চালিয়ে যাচ্ছে। সিভিল সোসাইটি সমূহ তো এনজিওদেরই সম্পূরক। আমাদের দেশের ট্রাস্টভিত্তিক এনজিও ও সিভিল সোসাইটি সমূহের মুনাফাবিহীন স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তত্ত্বের মতোই ইউনূসের মুনাফাবিহীন সামাজিক ব্যবসার তত্ত্ব। পূর্বোক্ত গ্রন্থে ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংক ও তার অঙ্গসংস্থা সমূহের বিশ্ববিস্তৃত কর্মকাণ্ডের বিবরণ যথাসম্ভব মহিমান্বিত করে দিয়েছেন। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মকাকাণ্ড ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসাতে সীমাবদ্ধ – এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। 'গ্রামীণ টেলিকম', 'গ্রামীণ ফোন', 'গ্রামীণ শক্তি' (energy), 'গ্রামীণ কল্যাণ', 'গ্রামীণ ফিসারিজ এ্যান্ড লাইভস্টক', 'গ্রামীণ শিক্ষা', 'গ্রামীণ উদ্যোগ', 'গ্রামীণ সামগ্রী' এবং 'গ্রামীণ হেল্থকেয়ার' ইত্যাদি ব্যবসা এবং কোনো কোনো পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানির সঙ্গে গ্রামীণ কোম্পানিসমূহের যৌথ উদ্যোগের বিবরণ লক্ষ করলে গ্রামীণের বহুজাতিক ব্যবসার (multinaltonal) বিশালতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এসব ব্যবসা কি 'মুনাফাবিহীন' ও 'সামাজিক'? পূর্বোক্ত গ্রন্থে ইউনূস উলেখ করেছেন, গ্রামীণ কোম্পানি সমূহের যৌথ ব্যবসা রয়েছে ফরাসি বহুজাতিক দুধের কোম্পানি ডানো (Danone), ফরাসি বহুজাতিক পানি সরবরাহের কোম্পানি ভেয়োলিয়া (Veolia), জার্মানির মশারি তৈরির বিশাল কোম্পানি BASF, তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইনটেল কর্পোরেশন, জুতা তৈরির ক্ষেত্রে আদিদাস (Adidas), কাপড় ও পোশাক তৈরির ক্ষেত্রে Otto Gmbti ইত্যাদির সঙ্গে। গ্রামীণের এসব ব্যবসার মালিকানা ও মুনাফার ধরণ জানা গেলে বোঝা যেত গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চরিত্র। কীরকম মুনাফা ভিত্তিক সামাজিক ব্যবসা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের? ইউনুস মনে করেন, আগামী বিশ বছরের মধ্যেই প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তাঁর প্রদর্শিত এই ব্যবসার পথ ধরে ক্ষুধামুক্ত, দরিদ্র্যমুক্ত, পরিবেশদূষণমুক্ত, রোগমুক্ত, অশিক্ষামুক্ত, যুদ্ধমুক্ত, রাষ্ট্রীয় সীমানার প্রতিবন্ধকতামুক্ত উন্মুক্ত বিশ্বসংস্কৃতিতে নতুন ধরনের সমৃদ্ধ পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আগে প্রকাশিত তাঁর *Creating a World without Poverty* গ্রন্থেও তিনি ক্ষুদ্র ঋণের মুনাফাবিহীন স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার কথা বলেছেন। ইউনূস যাকে পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন, তা আসলে পুঁজিবাদী-সম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বিশ্বায়নের নামে এই বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই কাজ করে চলছে। দুর্বল দেশগুলোর জন্য নিঃরাজনীতিকরণের অঘোষিত পরিকল্পনা ও কার্যক্রম আছে এই প্রক্রিয়ায়। ১৯৮০-র দশক থেকে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের (১৯৯১) পর থেকে, পশ্চিমা বিশ্বের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারায় যে নবচেতনা দেখা দিয়েছে, ইউনূসের চিন্তা-চেতনা তারই অন্তর্গত। প্রথম থেকেই তাঁর কর্মকাণ্ড ও চিন্তার কঠোর বিরূপ সমালোচনাও আছে।

নতুন প্রযুক্তির বিস্তার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ধারায় ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক (unipolar) বিশ্বব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই চলছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ও ফুকুইয়ামা-হান্টিংটন-ইউনূসের চিন্তা ও কর্মযজ্ঞ। হীন-স্বার্থান্বেষীদের ও কায়েমি-স্বার্থবাদীদের নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ও তাতে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চিরস্থায়ী করার এই প্রচেষ্টায় সাধারণ মানুষকে গণ্য করা হচ্ছে নিতান্তই ধনিক-বণিকদের ও পররাষ্ট্রগ্রাসকারীদের হীনউদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র রূপে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষদের অস্তিত্ব ধনিক-বণিকদের সেবাদাস রূপে – তাদের দয়ার উপর। বিশ্বব্যাপী এটা সভ্যতা নয়, বর্বরতা। সম্পদ ও ক্ষমতা দুই দিক দিয়েই এই বিশ্বব্যবস্থার গতি মনোপলির দিকে। পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রের সরকার ও শাসকশ্রেণি, জ্ঞাতসারে হোক অথবা অজ্ঞাতে হোক, স্বেচ্ছায় হোক কিংবা অবস্থার চাপে পড়ে হোক, আজ এই চিন্তাধারা ও কর্মধারার অনুসারী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে; কিন্তু প্রতিবাদকারীদের উন্নততর নতুন বিশ্বব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জীবন প্রতিষ্ঠার বাস্তবসম্মত বাস্তবায়নসম্ভব কোনো লক্ষ্য নেই।

আগের ঐতিহাসিক পর্যায়ে (১৭৮৯-১৯৯১) ইউরোপে অনেক মনীষী গণতন্ত্র অবলম্বন করে মানবজাতির জন্য উন্নততর ভবিষ্যতের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল গণতন্ত্রকে মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচভাগ ধনিক-বণিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়েছে। গণমানুষের জন্য ওই গণতন্ত্র নির্যাতনমূলক হয়ে দাঁড়ায়। সে অবস্থায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আদর্শগত যে অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়, তাতে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন, মাও সেতুঙ মুক্তিকামী-সংগ্রামী জনগণের কল্যাণে গোটা মানবজাতির সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিকল্পিত বিকাশ আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপরীতে মানবজাতির হাজার বছরের ভবিষ্যতকে সামনে নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা মানবজাতিকে সমাজতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারায় বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। মনে হয় এটাই ছিল তাঁদের আন্তর্জাতিকতাবাদ। তাঁরা ভেবেছিলেন বিকাশশীল বিশ্বব্যবস্থার কথা। সুদূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটবে – কথাও তাঁরা বলেছিলেন। লেনিন অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমূহের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের (democratic centralism) এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের (peaceful coexistence) যে কর্মনীতি ঘোষণা করেছিলেন, মানবজাতির শান্তি ও প্রগতির জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জায়গায় দেখা দিল cold war আর গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের জায়গায় দেখা দিল দলীয় আমলাতন্ত্র (party bureaucracy)। সাম্রাজ্যবাদীরা হীন উপায়ে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রসারের ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চালিয়ে যেতে থাকে যুদ্ধের পর যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিরোধে মার্কসবাদীরা টিকতে পারেনি। চিন্তায় ও কাজে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রীরাও নিশ্চয়ই বড় রকমের ভুল করে চলছিলেন– যে জন্য তাঁরা তাঁদের ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে ও উন্নতিশীল রাখতে পারেননি। আজ পরিবর্তিত বাস্তবতায় অভিজ্ঞতার আলোকে সব কিছুর আমূল পুনর্গঠন ও সম্পূর্ণ নবায়ন দরকার। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অগ্রাহ্য করে মার্কসবাদীদের ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়েছিল। আর মার্কসবাদীরা চেয়েছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি নিয়ে পর্যায়ক্রমে আদর্শগত বিজয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি, গোয়েন্দানীতি, প্রচারনীতি, লগ্নিপুঁজি, বাণিজ্যনীতি ও যুদ্ধনীতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যে নীতি নিয়ে মার্কসবাদীরা চলছিলেন তাতে তাঁরা অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারেননি।

পুঁজিবাদী মহল থেকে বলা হত, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নেই। প্রশ্ন হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছিল? আছে? থাকবে? সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর এখন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বতন্ত্র্যের অবস্থা কেমন? বাংলাদেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে? আইনের শাসন আছে? ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন বাদ দিয়ে বলপ্রয়োগ করে, জুলুম-জবরদস্তি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ দিয়ে আইনের শাসন হয়? হবে? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বলা হত totalitarian. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কি শতকরা নিরানব্বই ভাগ মানুষের জন্য totalitarian নয়? pluralism-এর সুবিধা কয়জনে ভোগ করে? সম্পত্তিলিপ্সু মনোপলিপ্রবণ ক্ষমতাউন্মাদদের পুঁজিবাদী pluralism দিয়ে কি জনগণের স্বাধীনতার, স্বায়ত্বশাসনের, গণতন্ত্রের ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমস্যার সমাধান হচ্ছে? হবে? বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদী -মদদদাতাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সিভিল সোসাইটি ও এনজিও মহল থেকে যেভাবে pluralism প্রচার করা হচ্ছে, তা দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিলয়ের পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) থেকে রুশ বিপ্লব (১৯১৭), চিনবিপ্লব (১৯৪৯) ও উপনিবেশ দেশসমূহের স্বাধীনতাসংগ্রাম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় (১৯৯১) পর্যন্ত সময়ে বিশ্বব্যাপী ঘটনাপ্রবাহের যে প্রকৃতি ছিল, তা থেকে মানবজাতির আজকের ঘটনাপ্রবাহের প্রকৃতি গুণগতভাবে ভিন্ন। জনগণের মন-মানসিকতা বদলে গেছে। সেটা ছিল প্রগতির যুগ – বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের ন্যায়ের পথে এগিয়ে চলার যুগ, শোষণ-বঞ্চনা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে জনগণের সংগ্রামের ও বিজয় অর্জনের যুগ। অপশক্তি তখন প্রগতিশীল সকল কাজেই বাধা দিয়েছে – নিজেদের হীন স্বার্থে জনগণের জন্য ভালো যে কোনো কিছুতে বাধা দিয়ে প্রতিক্রিয়ার ধর্ম পালন করছে। তবে প্রতিক্রিয়াশীলেরা তখন ধাপে ধাপে দুর্বল ও পরাজিত হচ্ছিল। বিশ্বব্যাপী জনগণ তখন জাগ্রত ছিল। তাদের সামনে মুক্তির ও উন্নতির লক্ষ্য ছিল। তাদের জীবনধারায় সাধনা ও সংগ্রাম ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে অবস্থা পরিবর্তিত হতে থাকে। অবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের

বিলয়ের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রগতিবিরোধী কায়েমী-স্বার্থবাদী অপশক্তির কর্তৃত্ব এখন বিশ্বব্যাপী। মানবজাতি এখন আর প্রগতির যুগে নেই, দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়ার যুগে পড়েছে। আগে উল্লেখ করেছি, রেনেসাঁস, শিল্পবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদির উপলব্ধি নিয়ে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকাশশীল মানুষ উপলব্ধি করেছিল – মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি ও শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে, জেনারেশনের পর জেনারেশনের চেষ্টায়, পৃথিবীকে পরিবর্তন করে মনের মতো রূপ দিতে পারবে – ক্রমাগত প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে এগোতে পারবে। মানুষের মধ্যে প্রগতির উপলব্ধি ছিল, আশা ছিল, স্বপ্ন-কল্পনা ছিল, সাধনা ও সংগ্রাম ছিল। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ প্রতিক্রিয়াশীলেরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিলুপ্ত করেছে, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে বিকৃত রূপ দিয়েছে, আফগানিস্তানে ইরাকে লিবিয়ায় স্থল-জল-অন্তরীক্ষ থেকে সর্বাত্মক যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-কথিত উদার গণতন্ত্র কায়েম করেছে। এর বিরুদ্ধে প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে নঞর্থক (negative) নিষ্ফলা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আছে, সদর্থক (positive) গঠনমূলক নতুন উলেখযোগ্য কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। এ-অবস্থায় সাধারণ মানুষের আশার প্রদীপ নির্বাপিত। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অগ্রগতির বর্তমান ধারা পৃথিবীর সর্বত্র বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রাকেই শঙ্কিত করে তুলেছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে আজ যা চালানো হচ্ছে তা সভ্যতা ও সংস্কৃতির কুৎসিত, কদর্য, বীভৎস, ভয়াবহ বিকার।

সন্দেহ নেই, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর মানবজাতি যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সভ্যতার ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে, বিপথগামী হয়ে, এক ভয়াবহ সঙ্কটের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। মানবজাতিকে এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে উদ্ধারকামী শক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির চেয়ে বড় প্রস্তুতি নিতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বিপ্লব ইত্যাদি সম্পর্কে আগেকার ধারণা নিয়ে, আগেকার অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি দ্বারা কিছুই করা যাবে না, সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তুতি লাগবে। গোটা মানবজাতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ও যুক্তরাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা যথার্থই যুগান্তকারী ঘটনা। নতুন সভ্যতার প্রয়োজনে চিন্তার জগতে সব কিছুকে ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে নিতে হবে। প্রগতির পথে বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জনে কিছু দূর এগোতে পারলে পরে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য শক্তি অর্জন দুঃসাধ্য থাকবে না। সব কিছুর মর্মে বিজ্ঞানসম্মত প্রগতিশীল নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই থাকতে হবে। আদর্শের পুনর্গঠন, নবায়ন ও বিকাশ অবশ্যই সাধন করতে হবে। অতীতচারিতা, পশ্চাৎমুখিতা, স্থবিরতা, হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তা বর্জনীয়। প্রথমে অতীতের প্রতিটি আদর্শের উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতিকে পূর্বধারণামুক্ত অনাচ্ছন্ন মন নিয়ে ইতিহাসের দিক দিয়ে বুঝতে হবে। ইতিহাসকেও পুনর্গঠিত করতে হবে। নানা আদর্শের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলবে। প্রতিযোগিতাকে হতে হবে শান্তিপূর্ণ। তাতে থাকতে হবে মূল্যবোধ ও যুক্তি-পরম্পরা। বর্তমান ঐতিহাসিক পর্যায়ের জন্য আমি যে আদর্শ অবলম্বনের প্রয়োজন উপলব্ধি করি, তা হল জনগণের গণতন্ত্র বা শতভাগ গণতন্ত্র মানুষের গণতন্ত্র বা সর্বজনীন গণতন্ত্র যাকে আমি 'নয়াগণতন্ত্র' বলে অভিহিত করি। বিশ্বব্যাপী প্রচারিত কায়েমি-স্বার্থবাদীদের 'উদার গণতন্ত্র' থেকে 'নয়াগণতন্ত্র ভিন্ন। (এর রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আমার ধারণা আমি *গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র* গ্রন্থে এবং *আটাশ দফা : আমাদের মুক্তি ও উন্নতির কর্মসূচি* পুস্তিকায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি।)

৫. 'নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র' ও তার সম্পূরক 'আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র'

কোনো জাতির সভ্যতা কেবল তার অজ্ঞাতে হয়ে ওঠার ব্যাপার নয়, মূলত তার জ্ঞাতসারে তার নিজেকে ও পরিবেশকে গড়ে তোলার ব্যাপার। নতুন সভ্যতা সৃষ্টির প্রয়োজনে মানবজাতিকে আজ জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি বিষয়কে জনগণের দিক থেকে – ইতিহাসের দিক থেকে – গভীরভাবে বুঝে নিতে হবে। সেই সঙ্গে বুঝতে হবে আমাদের প্রস্তাবিত নয়াগণতন্ত্রের, বা জনগণের গণতন্ত্রের বা শতভাগ মানুষের গনতন্ত্রের, বা সর্বজনীন গণতন্ত্রের রূপ ও প্রকৃতি। ভবিষ্যতের অভিপ্রেত নতুন ব্যক্তিজীবন, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও নতুন বিশ্বব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট থাকতে হবে।

প্রথমেই লক্ষ করা দরকার যে, *'দেশ' ও 'রাষ্ট্র' এক নয়।* দেশ প্রকৃতির সৃষ্টি, রাষ্ট্র মানুষের। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি ইত্যাদি দুর্লঙ্ঘ্য নানা কিছু দ্বারা পরিবেষ্টিত এক একটি বিশাল ভূভাগ হল এক একটি দেশ। তাতে

জমি-জমা থাকে, নদী-নালা খাল-বিল গাছপালা থাকে, আকাশ-বাতাশ থাকে। শিল্পবিপ্লবের বিকাশের ফলে ইউরোপে যাতায়াত ও যোগাযোগ ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডী অতিক্রম করে দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়, এবং তাতে জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের তাগিদ দেখা দেয়। এরই মধ্যে মানুষের অধিকারবোধ ও গণতান্ত্রিক আবেগও বিকশিত হয়। সেটা ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) ও তার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ঘটনা। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারারও তখন উন্মেষ ও বিকাশ ঘটতে থাকে। ইউরোপ থেকে চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে যায় সকল দেশে। শিল্পবিপ্লবের আগে মানুষের যাতায়াত ও যোগাযোগ দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়নি। তখন মানুষের জীবনপ্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্র অঞ্চলে। কোথাও কোথাও বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হলেও সেকালে এই আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতা কাটেনি।

আধুনিক যুগের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রের জন্য একসঙ্গে দরকার হয় সুনির্দিষ্ট ভূভাগ, সেই ভূভাগের ঐক্যবোধসম্পন্ন (বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য) আত্মসচেতন জনগণ, সেই ভূভাগ ও সেই জনগণের সরকার, এবং রাষ্ট্রীয় সকল ব্যাপারে সেই জনগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্রের জন্য এই চারটি উপাদান এক সঙ্গে স্থায়ীভাবে দরকার হয়। *আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার গঠিত হয় দল দ্বারা। রাজনৈতিক দলকেও রাষ্ট্রের অন্যতম গঠনকর উপাদান রূপে গণ্য করা সমীচীন।* সংশ্লিষ্ট জনগণকে সজ্ঞানে সচেতন প্রয়াস দ্বারা রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হয়, রাষ্ট্র আপনিতেই হয় না। রাষ্ট্রগঠন ও রাষ্ট্রের উন্নতি সংশ্লিষ্ট জনগণের নিরন্তর প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ব্যাপার। ফরাসি বিপ-বের মধ্য দিয়ে ইউরোপে জনগণের মধ্যে জাতিরাষ্ট্র গঠনের আগ্রহ সূচিত হয়। জনমনে ধারণা সৃষ্টি হয় – আমরা যদি আমাদের দেশে আমাদের জন্য একটি ভালো রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারি, তাহলে সেই রাষ্ট্রে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো জীবন যাপন সম্ভব হবে। শিল্পবিপ্লবের সূচনা পর্বে, সামন্তযুগের অন্তিম পর্যায়ে, গির্জা, সামন্তপ্রভু ও রাজার কর্তৃত্বকালেই ক্রমিক গতিতে দেখা দেয় এই চেতনা। এ অবস্থার মধ্যেই জাতিরাষ্ট্র গঠনের তাগিদ সৃষ্টি হয়। জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জনগণের মধ্যে ঐক্য কমে গেলে বৈচিত্র্যপ্রবণতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে, রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায় এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য না থাকলে রাষ্ট্র টেকে না। রাষ্ট্র গঠনের জন্য জাতীয় সাধনা ও জাতীয় সংগ্রামের গভীরে দরকার হয় ব্যক্তিমানুষের নিরন্তর আত্মগঠন। কেবল স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ নিয়ে রাষ্ট্র হয় না। রাষ্ট্র গঠন করার জন্য বুদ্ধি, যুক্তি, জ্ঞান, বিচার-বিবেচনা, সততা, প্রজ্ঞা ও কাজ দরকার হয়। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রের ক্ষতিকর। বহুত্বমূলক সমন্বয়ের ধারণা রাষ্ট্রের অনুকূল।

দৈশিক জাতীয়তাবোধ কালক্রমে উন্নীত হয় জাতীয়তাবাদে বা জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মতবাদে। জাতিরাষ্ট্র গঠনের জন্য আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করতে হয় গণতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রকে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পটভূমিতে আছে বিভিন্ন দেশের সিনকুয়েসেন্টু, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট, রেনেসাঁস, ইত্যাদি সংস্কৃতিক আন্দোলন। সাধারণত এই সবগুলো ব্যাপার একত্রে রেনেসাঁস বলে অভিহিত হয়। শিল্পবিপব এক চলমান প্রক্রিয়া, আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে আড়াইশো বছরের বেশি সময় ধরে চলছে, তাতে আছে নানা পর্যায়।

জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সাধারণত আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত, ভাষিক ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নানা জনসম্প্রদায় থাকে। জনসাধারণের মধ্যে এই বৈচিত্র্য বিরাজ করার ফলে জাতীয় ঐক্যে সমস্যা দেখা দেয়। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে'র কিংবা 'বহুত্বমূলক সমন্বয়ে'র নীতি অবলম্বন করে এই সমস্যার সমাধান করতে হয়। বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী ঐক্যে যেমন গুরুত্ব দিতে হয়, তেমনি গুরুত্ব দিতে হয় বৈচিত্র্যে। জাতিরাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভর করে জনগণের ঐক্যের উপর।

অপরদিকে, জাতিরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে দেখা দেয় মিত্রতামূলক কিংবা শত্রুতামূলক আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিকতাবোধ। কার্ল মার্কস ও তাঁর সহযোগীরা ১৮৪০-এর দশক থেকেই শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন। শিল্পবিপবের যে পর্যায়ে তাঁরা ছিলেন, তাতে আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা তাঁদের লেখায় স্পষ্ট রূপ পায়নি। জাতি, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতিরাষ্ট্র ইত্যাদির স্বাভাবিক বিকাশের জন্যই দরকার আন্তর্জাতিকতাবাদ। জাতিরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আদান-প্রদান বৃদ্ধি, বিরোধ মীমাংসা, যুদ্ধের সম্ভাবনাকে তিরোহিত করা, যুদ্ধ লেগে গেলে যুদ্ধ থামানো, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ইত্যাদি আন্তর্জাতিকতাবাদের লক্ষ। আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতীয়তাবাদের সম্পূরক।

আন্তর্জাতিকতাবাদের বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ অপরিহার্য। আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারণা স্পষ্ট হয় দুই বিশ্বযুদ্ধের এবং League of Nations ও UNO-র প্রতিষ্ঠাকালে। তখন আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনেকে অনুভব করেন। এর অনেক আগেই সূচিত হয় জাতীয়তাবাদের বিকৃত বিকাশ– উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। আন্তর্জাতিকতাবাদের বিকাশ এই বিকারের প্রতিকার সন্ধানের জন্য। এর মধ্যে ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর দেখা দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের মতবাদ।

শুরুতেই উলেখ করেছি তথ্যপ্রযুক্তি, জীবপ্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির বিপ্লব বিস্তার পৃথিবীতে ঘটিয়েছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ও নতুন প্রযুক্তির অভিঘাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয় ঘটে, এবং তার পর সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে উদ্ভাবিত হয় বিশ্বায়নের বা এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মতবাদ (unipolerism বা globalism)। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলোপের পর ১৯৯০-এর দশকে উপনিবেশবাদ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ধারা ধরে বিশ্বয়নের বা এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মতবাদ দেখা দিয়েছে – বিশ্বায়নের মতবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের ধারা ধরে দেখা দেয়নি। বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদেরই উচ্চতর পর্যায়। 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আজকের বিশ্বায়ন' আর 'সাম্রাজ্যবাদ' এক ও অভিন্ন। বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদেরই নতুন পর্যায়।

আন্তর্জাতিকতাবাদ (internationalism) ও বিশ্বায়নবাদ (globalism/unipolerism) এক নয়। আগে উল্লেখ করেছি, আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতি, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতিরাষ্ট্রকে বিকাশশীল রূপে রক্ষা করতে চায়। জাতিরাষ্ট্র সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ও আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুদ্ধের সমস্যার সমাধান করা, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্প্রীতি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের মনোভাব সৃষ্টি করা ইত্যাদি এর উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিকতাবাদের ঐতিহাসিক প্রবণতা ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দিকে। অপরদিকে বিশ্বায়নবাদীরা নিজেদের অভিসন্ধি গোপন রেখে, জাতিরাষ্ট্র বিলুপ্ত করে, ওয়াশিংটনকেন্দ্রিক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বর্তমান সময়ের নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে চালানো হচ্ছে বিশ্বায়নের কার্যক্রম। জাতিসঙ্ঘ, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, জি সেভেন (যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান) কাজ করছে বিশ্বায়নের উদ্ভাবক, বাস্তবায়নকারী ও কর্তৃপক্ষ রূপে। এসবের কেন্দ্রীয় পরিচালনায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সরকার। বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় তারা কাজ করছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে – নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করার আনন্দ নিয়ে। যাঁরা কেবল শতকরা পাঁচ ভাগের নয়, অবশিষ্ট শতকরা পঁচানব্বই ভাগসমেত মুক্তি ও উন্নতি চিন্তা করেন, তাঁদের চিন্তাধারায় এখন কোনো জোয়ার দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে কেবল ভাটা।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে সিভিল সোসাইটি ও এনজিও মহল থেকে খুব সামনে আনা হচ্ছে। সেজন্য বিষয়টি মনোযোগ দাবি করে। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জয়-জয়কার আর ফ্যাসিবাদের আত্মপ্রকাশের কালে মানবজাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কিত হয়ে টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও আরো কোনো কোনো ভাবুক কঠোরভাবে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেছেন এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ও বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে রবীন্দ্রনাথ missionary zeal নিয়ে nationalism-এর বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ইংরেজিতে লিখে এশিয়া-ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচার করেছেন। টলস্টয় বিশ্বব্যাপী তাঁর সর্বজনীন কল্যাণের ও অহিংসার আদর্শ বাস্তবায়নের পথে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় সরকারকে বড় অন্তরায় মনে করেছেন। সরকারের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল বিরূপ। রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা তিনি বুঝতে চাননি। অহিংস রাষ্ট্র ও অহিংস বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপায় সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বাস্তবসম্মত ছিল না। বৃহৎ শক্তিবর্গের আগ্রাসী ভূমিকা দেখে তিনি পীড়িত হয়েছেন, এবং জাতীয়তাবাদের বিকার– উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকেই মনে করেছেন জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের অন্যায়, ইউরোপীয় সভ্যতার ধারায় অপশক্তির উত্থান ও যুদ্ধের নির্মমতা দেখে শঙ্কিত পীড়িত ও বিচলিত হয়েছেন। রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা ও কল্যাণকর সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি চিন্তা করেননি। অশুভের অপনোদন ও শুভের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কেও তাঁর চিন্তা বাস্তবসম্মত ছিল না। ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসনকে মেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবন

অতিবাহিত করেছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা তিনি ভাবেননি। হয়তো সেজন্যও তাঁর মন রাষ্ট্রের প্রশ্ন বাদ দিয়ে সমাজ গঠনের দিকে ধাবিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধে যেতে চাননি। টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রের বিরোধিতা করলেও স্বদেশপ্রীতির বিরোধিতা করেননি। স্বদেশপ্রীতিতে স্বদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্র বাদ দিয়ে জনগণের আত্মশক্তি অর্জন, ছোট ছোট সংগঠন অবলম্বন করে সমাজ গঠন ও সমাজ পরিচালনা এবং সমবায় সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, জাতি ও রাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে সেগুলো কতখানি বাস্তবসম্মত ও বাস্তবায়নসম্ভব তা বিচার করা যেতে পারে। তা দ্বারা পরাধীনতার সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। টলস্টয়ও সরকার ও রাষ্ট্রের বিবেচনা বাদ দিয়ে সর্বজনীন কল্যাণের লক্ষ্যে চিন্তা ও কাজ করেছেন। আমার কাছে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথের এইসব চিন্তাকে মরমিয়া সাধকদের চিন্তারই পরিমার্জিত পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। জাতি ও রাষ্ট্রের কাজ এভাবে সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, টলস্টয় ও *রবীন্দ্রনাথ উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদকেই জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতীয়তাবাদের অনিবার্য পরিণতি মনে করেছেন। জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক বিকাশ এবং জাতীয়তাবাদের সম্পূরক আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা তাঁরা ভাবতে পারেননি।* জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ ও জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব বিকাশ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে তাঁরা বিবেচনা করেননি। জাতীয়তাবোধ ও জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক বিকাশ আর বিকারের পার্থক্য তাঁরা বুঝতে চাননি। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, সভ্যতার ধারা থেকে জাতি ও রাষ্ট্র স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার নয়। তাঁরা লক্ষ করেননি যে, সবই মানুষের তৈরি নয়, অনেক কিছুই প্রাকৃতিক – অনেক কিছুই মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছানিরপেক্ষ। তাঁরা ভেবে দেখেননি যে, সমস্যার মূলে জাতি ও রাষ্ট্র নয়, সমস্যার মূলে আছে মানবস্বভাবের জটিলতা; জাতি ও রাষ্ট্র বিলুপ্ত করে দিলেও মানবস্বভাবের জটিলতার কারণে সমস্যার সমাধান হবে না। মানবস্বভাবের জটিলতা কমানো যাবে কীভাবে, তা নিয়ে ভাবতে হবে। টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের মূল মনে করেছেন জাতি ও রাষ্ট্রকে। যুদ্ধ নিয়ে তাঁরা বিচলিত হয়েছেন; কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যুদ্ধের কারণ ও যুদ্ধ দূর করার উপায় সন্ধান করেননি – যেমনটা আইনস্টাইন যুদ্ধ বিষয়ে ফ্রয়েডের কাছে চিঠি লিখে করেছিলেন। রাষ্ট্রের মধ্যে তাঁরা কেবল অকল্যাণই দেখেছেন, রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা, কল্যাণকর ভূমিকা ও সম্ভাবনা বিবেচনা করেননি। রাষ্ট্র ও সরকারকে উন্নত করা যে সম্ভব, এটাও তাঁরা ভেবে দেখেননি। তাঁদের মনে এমন ধারণা জাগেনি যে, রাষ্ট্রই হতে পারে মানবকল্যাণ সাধনের সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট অবলম্বন। রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য মানবস্বভাবের উন্নতিতে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন তাঁরা উপলব্ধি করেননি। রাষ্ট্রের বিকল্প না ভেবেই তাঁরা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন। কখনো কখনো তাঁরা কেবল সরকারকেই মনে করেছেন রাষ্ট্র– সরকার ও রাষ্ট্রের পার্থক্য বুঝতে চাননি। তবে টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই অন্তহীন আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল রাষ্ট্রের বিবেচনা বাদ দিয়ে ব্যক্তিমানুষদের ভেতর থেকে পুনর্গঠিত করার কাজে। ব্যক্তিমানুষ যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এটা তাঁরা কখনো কখনো ভুলে গিয়েছেন। সিভিল সোসাইটি ও এনজিও মহল জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয় কেবল এই জন্য যে, এই বক্তব্য তাদের অঘোষিত নিঃরাজনীতিকরণ-কার্যক্রমের সহায়ক। সিভিল সোসাইটিকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁরা পলিটিকাল সোসাইটিকে দুর্বল করতে চান।

বিশ্বায়নের মতবাদের মাত্র কিছু বিষয়ই ঘোষিত ও প্রকাশ্য, অনেক কিছুই অঘোষিত ও গোপন। যুক্তরাষ্ট্র তার অনেক অভিসন্ধিকেই (দুরভিসন্ধি?) গোপন রেখে কার্যকর করে – কার্যকর করার আগে বিশ্ববাসীকে জানতে দেয় না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর প্রায় সব আচরণে সচেতন ও কার্যকর কূটনীতি থাকে। বিদেশীদের কূটনীতিকে যারা সরলভাবে নিজেদের নীতি রূপে গ্রহণ করে, তারা প্রতারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'আধিপত্য ও নির্ভরশীলতা নীতি' বিশ্বায়নবাদেরও অঘোষিত মূল নীতি। এর সঙ্গে যুক্ত আছে তার কূটনীতি, গোয়েন্দানীতি, প্রাচারনীতি, লগ্নিপুঁজি, অস্ত্রের ব্যবসা ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সকল রাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণির লোকদের হীন-স্বার্থবুদ্ধি, লোভ ও বিকারপ্রাপ্ত জীবনজগতদৃষ্টির 'কূটনৈতিক অভিব্যক্তি' আছে বিশ্বায়নবাদে। বাস্তবে জনগণের জন্য এর রূপ ও প্রকৃতি বঞ্চনামূলক, প্রতারণামূলক ও নির্মম।

মানবজাতির জন্য বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা থেকে উন্নততর নতুন বিশ্বব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়ার মহান অবলম্বন হবে 'নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার লক্ষ ও কর্মসূচি। বিশ্বসরকার

হবে নয়াগণতান্ত্রিক জাতীয়-সরকারসমূহের ঊর্ধ্বতন এক সরকার। তাতে জাতীয় সরকারের কিছু ক্ষমতা চলে যাবে বিশ্বসরকারের কাছে। জাতীয় সরকার বিলুপ্ত হবে না – থাকবে। জাতীয় সরকারকেই বিশ্বসরকারের সহযোগে প্রায় সব দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী বিবেকবান চিন্তাশীল সকলেরই কর্তব্য, নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি উদ্ভাবন করা এবং তার অনুকূলে আন্তর্জাতিক আন্দোলন গড়ে তোলা। বিশ্বরাষ্ট্রের কাছে একটিমাত্র সেনাবাহিনী রেখে জাতিরাষ্ট্র সমূহের সব সেনাবাহিনী বিলুপ্ত করা যাবে। তাতে অস্ত্রের আয়োজন ও অস্ত্রউৎপাদন বন্ধ হবে। বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে বর্তমান আন্তরাষ্ট্রিক সম্পর্কের অনেক কিছুই বদলে যাবে। বিশ্বরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে জাতীয় ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি, জাতি ও জাতিরাষ্ট্র থাকবে।

আজকের সভ্যতার সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য নয়াগণতান্ত্রিক জাতিরাষ্ট্র ও তার সম্পূরক আন্তর্জাতিক ফেডারেল বিশ্বরাষ্ট্রের রূপ ও প্রকৃতি বিষয়ে সকল জাতির বিবেকবান চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই পরিপূর্ণ গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করা ও ভাববিনিময় করা কর্তব্য। এ-নিয়ে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও স্বপ্ন-কল্পনা দেখা দেবে বলে আশা করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলয়ের পর, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে আবেদনহীন ক'রে ফেলার পর ক্রমে এটাই হয়ে উঠবে মানবজাতীর দিশা। মানবজাতির মধ্যে শুভবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের দুষ্টবুদ্ধি অবশ্যই পরাজিত হবে এবং জনগণের উন্নততর নতুন বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বিশ্বরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির, বিশ্বভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির, উন্নত জীবনের এবং উৎপাদনশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। এ-বিষয়ে নতুন চিন্তা ও কাজের সূত্রপাত হলে মাত্র বিশ বছরের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী জনগণের মন-মানসিকতা অনেক উন্নত হবে এবং জনমনে সম্প্রীতিময় প্রগতিশীল নতুন পৃথিবী সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা জাগবে। তাতে অল্প কালের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী মানবীয় সবকিছু নতুন রূপ লাভ করবে এবং মানবজাতির ইতিহাসে দেখা দেবে নতুন সভ্যতা। এখন নতুন সভ্যতার উন্মেষপর্বের অপরিণত চিন্তা-ভাবনা সব জাতির ভেতর থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাববিনিময় এবং পারম্পর্য ও সমন্বয় দেখা দিলেই সেগুলো নতুন প্রাণশক্তি লাভ করবে এবং কার্যকরভাবে বিকশিত হয়ে চলবে। এর জন্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে।

ঢাকা, মার্চ ২০১২

গ্রন্থপঞ্জি

Albert Schweitzer, *The Decay and Restoration of Civilization* (Eng. trans), London, 1923

.... Civilization and Ethics (Eng, trans), London, 1923

Oswald Spengler, *The Decline of the West,* 2 vols (Eng. trans), New York, 1926, 1928

H.G. Wells, *A Short History of the World*, Penguin Books, 1946.

Arnold Toyenbee, *The World and the West,* London, 1912.

.... *A Study of History* (abridgement of volumes I-VI by D.C. Somervell), New York, 1946.

V. Gordon Childe, *What Happened in History*, London 1963.

.... *Man Makes Himself,* Pengin Books, 1951.

Herbert Marcuse, *One Dimentional Man*, G.B. 1964.

Albert Bergesen edited, Crises in the World-System, London, 1983

Errol E. Harris & James A. Yunker edited, *Toward Genuine Global Governance,* London, 1999.

Our Golbal Neighbourhood : the Report of the Commission on Global Governance, Oxford University Press, 1995.

Willis Harman, *Global Mind Change : The New Age Revolution in the Way We Think,* New Youk, 1988.

Han Nianlong, *Diplomacy of Contemporary China,* Hong Kong, 1990.

Rebert Cox, *Approaches to World Order*, New Youk, 1996.

Meghnad Desai & Paul Redfern ediled, *Global Govenance : Ethics and Economics of the World Order,* New Youk, 1995.

J.G.De Beus, *The Future of the Wast,* london, 1953

R. Palme Dutt, *Problems of Chontemporary History,* London 1963.

Erich Fromm, *The Sane Society*, New York, 1955.

.... *The Fear of Freedonm*, G.B, 1942.

.... *To Be or To Have,* G.B, 1940.

Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man,* first published in the USA, in Great Britain and in Peuguiu Books : 1992

Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order,* first publishhed in the USA : 1996, published in Penguin Books, 1997.

J.B. Bury, *The Idea of Progress,* New York, 1960

Muhammad Yunus, *Building Social Business : the New Kind of Capitalism that Servers Humanity's Most Pressing Needs,* USA, 2010.

.... *Creating a World without Poverty : Social Business and the Future of Capitalism*, New Youk, 2007.

Eric Hobswm, *How to Chang the World : Reflections on Marx and Marxism,* Yale University Press, 2011.

John, M. Hunn, *Contemporary Crisis of the Nation-State,* Weshington DC, 1994.

Bertrand Russel, *Has Man a Future,* London, 1961.

.... *Human Society in Ethics and Politics,* London, 1958.

.... *Power : A New Socail Analysis,* New York, 1938.

.... *History of Western Philosophy,* London, 1980.

Ernest Barker, *National Character,* London, 1948

Joseph E. Stiglitj, *Globalization and Its Disconlents,* New York, 2002

Nicholas Hagger, *The World Government : A Blueprint for a Universal World State,* UK, 2010

Uoity Yang, A *Global State through Democratic Federal World Government,* UK 2011

Samir Amin, *The World We Wish to See,* Yew Youk, 2009

Willium Morris, *How We Live and How We Might Live,* Kolkata, 2012

Saval Sarkar, *Eco-Socialism or Eco-Copitilism,* London, 1999

Barbara Parkar, *Introduction to Globalization and Business,* New Delhi, 2005

Bhargava Reifeld, *Civil Society : Public Sphere and Citizanship,* New Delhi 2005

Gown Baylis, Steve Smith, Patricia Owners, *The Globalization of World Politics,* Oxford University Press, UK, 4th edition, 2008

Hans Lofgren & Prakash Sarangi edited, *The Politics and Culture of Globalization,* Delhi, 2009

Zygmust Beumah, *Postmodern Ethies,* Blackwell, Oxford, UK, Cambridge, USA, 1996.

সমির আমিন ও ফ্রাঁসোয়া উতার সম্পা. *প্রতিরোধের বিশ্বময়তা*, কলকাতা ২০০৪

শোভনলাল দাশগুপ্ত, *সমাজ মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল*, কলকাতা, ২০০৯
বিবেকান্দ মুখোপাধ্যায়, *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস* (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা, ১৯৮৬
কাভালজিৎ সিং (মনোয়ার মোস্তফা ও এম এম আকাশ অনূদিত), *বিশ্বায়ন : কিছু অমীমাংসিত প্রশ্ন*, ঢাকা, ২০০৫
অমিয়কুমার বাগচি সম্পা., *বিশ্বায়ন : ভাবনা দুর্ভাবনা* (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) কলকাতা, ২০০২
জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিকল্প বিশ্বায়ন*, কলকাতা, ২০০৪
আনু মুহাম্মদ, *বিশ্বায়নের বৈপরীত্য*, ঢাকা, ২০০৩
শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য ও ইশিতা মুখোপাধ্যায় সম্পা., *নারী ও বিশ্বায়ন*, কলকাতা, ২০০৭
মাসুদুজ্জামান ও ফেরদৌস হোসেন সম্পা., বিশ্বায়ন *: সঙ্কট ও সম্ভাবনা*, ঢাকা, ২০০৪
বদরুদ্দীন উমর, *সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের মুখে সমাজতন্ত্রের পদধ্বনি*, ঢাকা, ২০১২
আনু মাহমুদ, *বাংলাদেশে এনজিও*, ঢাকা, ২০১১
.... এনজিও : *দরিদ্রতা : উন্নয়ন*, ঢাকা, ২০১১
ফকরুল চৌধুরী সম্পা., *সিভিল সোসাইটি*, ঢাকা, ২০০৮
.... সম্পা, *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, ঢাকা, ২০১১
অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*, কলকাতা, ২০১১
শামসুজ্জোহা মানিক, *মার্কসবাদের সঙ্কট ও বিপবের ভবিষ্যত*, ঢাকা, ২০১০
রতনতনু ঘোষ সম্পাদিত, *বহুমাত্রিক বিশ্বায়ন*, ঢাকা ২০০৯
আবুল কাসেম ফজলুল হক, *বিশ্বায়ন ও সভ্যতার ভবিষ্যত*, ঢাকা, ২০১২
........*গণতন্ত্র ও নয়াগণতন্ত্র*, ঢাকা, ২০১২
.... *প্রাচুর্যে রিক্ততা*, ঢাকা, ২০১০
আবুল কাসেম ফজলুল হক ও মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পা. *মানুষের স্বরূপ*, ঢাকা, ২০০৭